ফাহমিদ-উর-রহমান
মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান

সূচিপত্র

No culture can appear or develop except in relation to a religion.

– T.S. Eliot

মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান

সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটার ব্যবহার বাংলা ভাষায় খুব পুরোনো ঘটনা নয়। ইংরেজি 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটাকে বাংলায় গ্রহণ করা হয়েছে। একসময় কালচার শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে কৃষ্টি, অনুশীলন, প্রকর্ষ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। এখন সংস্কৃতি শব্দটাই বেশি চলে। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটিকে বেশি পছন্দ করেছেন এবং তার সমর্থনে এই শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

যারা ইসলামি বাংলার পক্ষপাতী, তারা সংস্কৃতি অর্থে 'তমুদ্দুন' শব্দটা ব্যবহার করেন। তমুদ্দুন কথাটার উৎপত্তি আরবি 'মাদানুন' শব্দ থেকে, যার অর্থ শহর। শহরকে কেন্দ্র করেই প্রথম গড়ে উঠে সভ্যতা, নাগরিক আচরণ ও মূল্যবোধ। সেই হিসেবে তমুদ্দুন কথাটার যথার্থ মূল্য। লাতিন ভাষায় সিভিলাইজেশন কথাটার মানেও দাঁড়ায় নাগরিক জীবনযাত্রা বা জীবনরীতি।

'কৃষ্টি' শব্দটা কর্ষণ বা চাষ অর্থে কালচার শব্দের বেশি কাছাকাছি বলে মনে হয়। সংস্কৃতি শব্দটা বরং ইংরেজি রিফাইনমেন্ট অর্থে বেশি মানায়। তারপরও কথা হলো– কোন শব্দ বা শব্দপুঞ্জ কখন কোন জনসমাজের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে, তা বলা মুশকিল। তবে একটা শব্দ কখনও একটা জনসমাজের দীর্ঘদিনের মিলিত ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনার প্রতীক হয়ে ওঠে।

আরবিতে আরেকটা শব্দ হলো 'তাহজিব'। তাহজিব অর্থ ঘষে ঘষে চকচকে করা। ইংরেজি কালচার ও বাংলা সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যুৎপত্তিগত দিক বিচার করলে তাহজিবকে কাছাকাছি বলে মনে হয়। অন্যদিকে তমুদ্দুনকে মনে হয় সভ্যতা শব্দের নিকটতর।

ইংরেজি কালচার শব্দের মতো বাংলা সংস্কৃতি শব্দটির তাৎপর্য ও সীমানাও সুস্পষ্ট নয়। এর একটি জুতসই সংজ্ঞা হাজির করাও বেশ কঠিন। অনেক সময় আমরা কালচার্ড ও আনকালচার্ড শব্দের পার্থক্য দেখিয়ে সংস্কৃতি বলতে এক উন্নত রুচি ও ভাবের দিকে ইঙ্গিত করি। কিন্তু সংস্কৃতির সীমানা তার চেয়েও ব্যাপক।

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমে তাই 'সংস্কৃতি' ব্যাপারে পণ্ডিতরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আবার তারা কখনও কখনও কালচার ও সিভিলাইজেশনের সীমানার মধ্যেও গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। কাকে বলব কালচার, কাকে বলব সিভিলাইজেশন– তা নিয়েও চলেছে দীর্ঘ বিতর্ক। ইংরেজিতে সিভিলাইজেশন শব্দটা এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার 'সিভিলিজাশিয়ঁ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ইংরেজি ভাষায় 'কালচার' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন। বেকনের পর ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন ইংল্যান্ডে ম্যাথু আর্নল্ড ও আমেরিকায় ওয়াল্ডু ইমার্সন। কিন্তু তারা কালচার শব্দকে যেভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করেছিলেন, সে অর্থ পশ্চিমে স্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তী প্রজন্মের পণ্ডিতরা সেই ব্যাখ্যাকে আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর করে তোলেন। ফলে কালচার শব্দটা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয়দের অনেক আগে থেকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে মুসলমানরা আলোচনা শুরু করেছিল। বলা চলে সভ্যতার আলোচনায় তারাই ছিল অগ্রণী। আঠারো-উনিশ শতকের আগে এ ব্যাপারে ইউরোপীয়দের কোনো ধারণাই ছিল না। চৌদ্দ শতকের মুসলিম বুদ্ধিজীবী, সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন সভ্যতা অর্থে প্রথম 'উমরান' শব্দটা ব্যবহার করেন এবং তিনি তাঁর মশহুর গ্রন্থ *আল মুকাদ্দিমা*-য় সর্বপ্রথম সভ্যতা নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। সুসংবদ্ধভাবে ইবনে খালদুনের আগে সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে আর কেউ এতখানি ভাবেনি। *আল মুকাদ্দিমা*-য় তিনি যেসব চিন্তা-ভাবনার কথা বলেছেন, এ কালের সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা আজও তা অতিক্রম করতে পারেননি। সভ্যতার বিবর্তনের কথা লিখতে গিয়ে তিনি সভ্যসমাজের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– এর থাকবে একটা উচ্চতর ধর্মনীতি, একটা সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র, একটা

আইনি পদ্ধতি, নগরজীবন, লেখার প্রণালী এবং চারু ও নন্দনকলার বিশেষ ধরন। এভাবে সভ্যতাকে বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করার বিদ্যাকে খালদুন বলেছেন 'ইলম আল উমরান'।

ইউরোপে রিফরমেশনের পর থেকে সেখানকার মানুষের চিন্তা-ভাবনায় একটা পরিবর্তন আসে। এ যুগে এসে ধর্মকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি নির্মাণ করার চিন্তা-ভাবনা বিকশিত হয় এবং কোনো কোনো পণ্ডিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে– এমনতর ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেন। এ নতুন সংস্কৃতির বুনিয়াদ হচ্ছে হিউম্যানিজম–মানবতাবাদ; কোনো অতিপ্রাকৃত রিলিজিয়ন নয়। এ প্রেক্ষিতেই আসে সেক্যুলার কালচারের কথা। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে পাশ্চাত্যে যতই সেক্যুলারিজমের কথা বলা হোক না কেন, সেখানকার সমাজ কিন্তু আজও পুরোপুরি সেক্যুলার হতে পারেনি। এ কারণেই আজও পাশ্চাত্যের সমাজে খ্রিষ্টধর্ম কিছুটা হলেও কর্তৃত্ব করছে। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়ট মনে করতেন, ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির জননী। আজকের যে পাশ্চাত্য বা খ্রিষ্টান সংস্কৃতি, এলিয়ট মনে করতেন এর প্রাণস্বরূপে আছে ক্যাথলিক চার্চ ও ক্যাথলিক সংস্কৃতি।

পশ্চিমা সাহিত্যে কালচার কথাটা আজকাল বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন : এসথেটিক কালচার, এথিকাল কালচার, পলিটিক্যাল কালচার, ডেমোক্রাটিক কালচার, রোমান্টিক কালচার। এগুলো হচ্ছে মানুষের ভাব ও চিন্তার জগতের অভিজ্ঞতা এবং আলোড়নের ফল। পশ্চিমে একসময় যখন মার্ক্সবাদীরা প্রভাবশালী হয়ে উঠে, সংস্কৃতিকে তারা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিশ্লেষণের কথা বলেন। এ সূত্রেই আমরা শুনতে পাই প্রোলেতারিয়েত কালচার ও বুর্জোয়া কালচারের কথা। এভাবে সংস্কৃতিকে ভাগ ভাগ করে বিশ্লেষণের একটা সুবিধা হচ্ছে সংস্কৃতির জটিলতাকে কিছুটা হলেও কাটানো যায়। কিন্তু অসুবিধার দিকটা হলো– সংস্কৃতির সমগ্রটুকু একসাথে চোখে পড়ে না। নৃবিজ্ঞানীদের ঝোঁক এই সমগ্রটুকু নিয়ে। তারা সংস্কৃতি বলতে বোঝেন একটি জনসমাজের সামাজিক উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারের মধ্যে যেমন পড়ে খেত চষার লাঙল, নীতি চেতনা, ধর্মীয় ধ্যানধারণা তেমনি শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলা প্রভৃতি। এই হিসেবে নৃবিজ্ঞানীদের

কাছে সংস্কৃতি প্রত্যয়টি অনেক ব্যাপক। সে দিক দিয়ে টি. এস. এলিয়টের কথাটাই ঠিক। জীবনের নানা স্তরে মানুষের ভাবজগতে এক ধরনের আলোড়ন ঘটে এবং এই আলোড়ন প্রকাশের ক্ষেত্রে যে রূপ বা সৌন্দর্য তৈরি হয়, তা-ই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটির অর্থ খুব বেশি সুনির্দিষ্ট নয়। সংস্কৃতির সীমানা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আর কোন জায়গা থেকে ঠিক সভ্যতার শুরু– এই বিভাজনরেখা আজও নির্ধারণ করা যায়নি। এটা ঠিক, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বোঝায়। কিন্তু ভিন্ন জিনিস বলেই তাদের ভেতর কোনো সম্পর্ক নেই ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। একটা নজির দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। গাছ আর ফুল দুটি ভিন্ন অস্তিত্ব, কিন্তু সম্পর্কহীন নয় মোটেই। গাছ বাদ দিয়ে ফুলের কথা ভাবা যায় না, আবার ফুল বাদ দিয়ে গাছকে কল্পনা করাও কষ্টকর। সংস্কৃতি হচ্ছে আমার আমিত্ব, এককথায়– আত্মপরিচয়। আমি কী, আমি কী হতে পেরেছি, আমার নিজস্বতা– এইগুলো নিয়েই সংস্কৃতির কারবার।

ইকবাল বলেছেন, ব্যক্তির যেমন Ego বা পারসোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, তাঁর ভাষায় খুদি থাকে, তেমনি বৃহত্তর অর্থে একটা সমাজের সামাজিক খুদিও থাকে। একে বলা যায় কর্পোরেট পারসোনালিটি। ওই বিশেষ খুদির কারণে ওই সমাজের একটা Standard code of conduct, মুসলিম পরিভাষায় সামাজিক আখলাক বা ব্যবহারবিধি গড়ে ওঠে। ওই সামাজিক আখলাককে ওই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলে ধরা যায়।

সভ্যতা বলতে বোঝায় মানুষের কার্যধারার বিভিন্ন দিক, সামাজিক সংগঠন, প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। মানুষের যে বাইরের রূপ, সেই হলো সভ্যতা। এক দিক দিয়ে বলা যায়, সংস্কৃতি হলো আইডিয়া বা ভাবজগতের বস্তু। সভ্যতা বস্তুজগতের ব্যাপার। একজন পণ্ডিত বলেছেন, সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মনের সুখ বর্ধন করা। সভ্যতার কাজ হচ্ছে দেহের সুখ বর্ধন করা। যদিও এই পার্থক্য সব সময় সুনির্দিষ্টভাবে ধরে রাখা যায় না। মানুষ অনেক কিছু নিজের প্রয়োজনে তৈরি করে। সেই তৈরি করা জিনিসে তারা সৌন্দর্য আরোপ করে। যাকে মনে করা হয় সংস্কৃতির পরিচায়ক। এসব বস্তু

কিন্তু মানুষের দেহ ও মন উভয়েরই পরিতৃপ্তির কারণ হয়। অনেকে মনে করেন, সংস্কৃতি হচ্ছে তা-ই, যা মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের নিজের হাতে গড়া পরিবেশ। সংস্কৃতিবিহীন মানুষ চিন্তাই করা যায় না। যাদের আমরা আনকালচার্ড বলে তাচ্ছিল্য করি, আদিবাসী বলে উপেক্ষা করি, তাদেরও সংস্কৃতি আছে। তাদের নিজস্বতাই তাদের সংস্কৃতি।

সভ্যতা বলতে বোঝায় মানুষের ইতিহাসের একটি যুগ বিশেষের সংস্কৃতি। সভ্যতার জন্ম হয়েছে মানুষ যখন একত্রে বসবাস করতে শুরু করে তখন থেকে। তাদের মধ্যে উদ্ভব হয় জটিল নীতি-চেতনার। তারা বিভিন্নভাবে বিশেষ করে লেখনীর মাধ্যমে নিজেদের মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করে। এইভাবে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শনে-সাহিত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, কলা-কারিগরি-স্থাপত্যে মানুষের এগিয়ে যাওয়ার নামই সভ্যতা। সভ্যতা হচ্ছে ক্রমবিকাশমান মানব-মনের চিহ্ন। তাই সভ্যতা স্থানু নয়; সতত গতিশীল। এই কারণেই সভ্যতার কোনো টেরিটরিয়াল বা জিওগ্রাফিকাল বাউন্ডারি থাকে না। কিন্তু কালচারের ন্যাশনাল বাউন্ডারি অত্যাবশ্যক। সেই হিসেবে বলা যায়, এক জাতির একাধিক সংস্কৃতি থাকতে পারে, কিন্তু সিভিলাইজেশন বা সভ্যতা তার একটিই।

ব্যাপারটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক। মুসলিম সভ্যতা বলতে আমরা কোনো মুসলিম দেশের সভ্যতার কথা বোঝাই না, বোঝাই একটা যুগের বা কালের সভ্যতা অথবা দীর্ঘ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, বিজ্ঞানে-দর্শনে-স্থাপত্যে, ললিতকলা-বুদ্ধিবৃত্তির জগতে বিভিন্ন সময় মুসলমানদের দ্বারা যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তারই নাম মুসলিম সভ্যতা। সেই হিসেবে স্পেনের আল হামরা, মস্ক অব কর্ডোভা, দিল্লি-আগ্রার কুতুব মিনার, তাজমহল, মধ্যপ্রাচ্যের ক্যালিগ্রাফি, ইমাম গাজ্জালি-ইবনে রুশদ-ফারাবির দর্শন, রুমি-সাদি-খৈয়াম-ইকবাল-গালিবের রুবাইয়াৎ, গজল, কবিতা এই সভ্যতার অমূল্য ধন। এগুলো আজ কোনো ভৌগোলিক দেশের মুসলমানদের জাতীয় উত্তরাধিকার নয়; পৃথিবীর সব দেশের, সব মুসলমানদের যৌথ উত্তরাধিকার—এজমালি সম্পদ।

অন্যদিকে সংস্কৃতির একটা স্থানিক বা জাতীয় রূপ থাকে। ইসলাম যে দেশেই গিয়েছে, সেখানকার মাটি আর পরিবেশের সাথে মিলে নতুন নতুন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে ইসলামের মূল্যবোধের গুণে নতুন নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এটা ইসলামের বিচিত্র সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ। সেই হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সংস্কৃতি, সুদানের মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট রূপভেদ আছে। এই রূপভেদ ভাষা, জীবনপ্রণালি, সামাজিক প্রথা, খাবারের ধরণ, পোশাক-আশাক প্রভৃতির মধ্যে দৃশ্যমান। এই বৈচিত্র্য ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। কারণ, পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করে চলার জো নেই। ইসলাম যেহেতু ফিতরাতের ধর্ম তাই মানুষের বাস্তব প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়েই ইসলাম তার সংস্কৃতির বিচিত্র ফুল ফুটিয়েছে।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয় এটা সত্য। আবার দুটো ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস হয়েও এরা পরস্পর সম্পর্কিত। মধ্যযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সব সমাজেই রিলিজিয়নের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। রিলিজিয়নকে মনে করা হতো সংস্কৃতির উৎস। রিলিজিয়নই মানুষের চিন্তা ও কর্মের ওপর কর্তৃত্ব করত এবং এখনও বহু সমাজে তা করে থাকে। এর কারণ, ধর্মের একটা জীবনবোধ বা ইডিয়লজি থাকে। এই জীবনবোধের উত্থান, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা মানুষের মনে জাগে, তার থেকে। এই জীবনবোধ কিছুটা ইডিয়লজির আকারে থাকে– যা মানুষের ভাবজগতের বস্তু, আর কিছুটা আচারগত– যা মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে পালন করে। এইভাবে ধর্মের মাধ্যমে একদিকে একটা জ্ঞানকাণ্ড, তত্ত্বাংশ বা Theology গড়ে উঠে, অন্যদিকে সমাজের উপযোগী আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম আবার সংস্কৃতিকে সৃষ্টি ও নির্মাণ করে। তাই এককভাবে বলা যায়, ধর্ম যেমন সংস্কৃতির অংশ, তেমনি ধর্ম আবার সংস্কৃতির স্রষ্টাও। যেখানে ধর্ম সংস্কৃতির স্রষ্টা, সেখানে সংস্কৃতি ধর্মেরই অংশ। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক তাই বৈরিতার নয়; বরং সহযোগিতার।

ইউরোপে রেনেসাঁর পর থেকে সেখানে ধর্মের এই সৃজনমূলক ভূমিকাকে পাশ কাটিয়ে সংস্কৃতির প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা চলে। আবার ধর্মগত কালচার ছেড়ে জাতিগত কালচার বিকাশের কথা বলা হয়। এর পেছনে সেখানকার পণ্ডিতরা যুক্তি দিতে শুরু করেন জগৎ ও জীবনজিজ্ঞাসা কালে কালে বদলায়। মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদাও বদলায়। এমনিভাবে জীবনযাত্রার তাগিদে জগৎ ও জীবনচেতনা নতুন হয়। তাই কালচার যদি নতুন চেতনার তাগিদে নতুন নতুন ভাবে না বদলায়, তাহলে সমাজ অচল হয়ে যায়। এই অচলতা থেকে বাঁচার জন্যই আমাদের কালচারের সাধনা দরকার। ইউরোপের পণ্ডিতরা আমাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন কালচারের মতো ধর্মের লক্ষ্য সৃষ্টি নয়; এটি হচ্ছে মূলগতভাবে স্থিতিধর্মী। ধর্মের যে জীবনবোধ, তা শাশ্বত বা চিরন্তন। তাকে পরিবর্তন করা যায় না। এর থাকে নিজস্ব গৎবাধা 'কোড'। এক যুগের কোড দিয়ে ধর্ম চায় সবযুগের জীবনযাত্রাকে একটি বিশেষ ছকে বেঁধে ফেলতে। এই পণ্ডিতদের ধারণা– ধর্ম সৃষ্টি করে না; ধর্ম সৃষ্টিকে আটকিয়ে রাখে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই ধর্মবিষয়ক বিবেচনা সঠিক নয়। যুগের সাথে মিলিয়ে ধর্মের চলার মতো একধরনের নিজস্ব ডায়নামিজম আছে। একটা নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতা ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা না থাকলে যুগযুগান্তব্যাপী মানবসমাজে ধর্ম টিকে থাকতে পারত না কিংবা ধর্মের প্রেরণায় দেশে দেশে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, ইডিয়লজি, সমাজ-সংস্কৃতি সৃষ্টির বান জাগত না। যে জিনিস সৃষ্টি করতে পারে, যে জিনিস মানুষের মনের অনন্ত রস-পিপাসা নিবারণ করে, যে জিনিস মানুষের নশ্বরতা ও অস্থায়িত্বের মুখে তার পরম আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, তা কী করে গৎবাধা ও স্থিতিধর্মী হয়?

ধর্ম যখন সৃষ্টিশীল, তখন তাকে বড়োজোর বলা যায় ধর্মগত সংস্কৃতি। ধর্ম হিসেবে ইসলামের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বাছবিচার আছে। এই বিচারের ভিত্তিতেই ইসলাম তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তৈরি করে– যা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা-তফসির থেকে পৃথক। ইসলামের বিবেচনায় নিম্নশ্রেণির প্রজাতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উত্থান ঘটেনি। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি মানুষকে তৈরি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। সেই হিসেবে পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন সভ্য ও সুসংস্কৃত– যাকে আল্লাহ পৃথিবীর খলিফা মনোনীত করে একটি জীবনধারা, পদ্ধতি বা কোড সহকারে প্রেরণ

করেছিলেন। এই মানুষকে আমরা আল্লাহর নবি হিসেবে শ্রদ্ধা করি; যিনি এই পৃথিবীকে আবাদ করেন, নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করেন এবং জীবনের প্রাণচাঞ্চল্যে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেন। যে নতুন সমাজ তৈরি হয়, তার স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন পড়ে নতুন মূল্যবোধ। কোড, কন্ডাক্ট, অর্ডার। পয়গম্বরই আল্লাহর নীতির ভিত্তিতে দেখিয়ে দেন নতুন কোড অফ কন্ডাক্ট। এইভাবে সমাজ এগিয়ে চলে, নতুন সভ্যতার বিকাশ হয়। আবার কালের যাত্রাপথে এই সব সমাজের মধ্যে নানা রকম অসংগতি, বিকৃতি আসে। সেই বিকৃতি মোচনে নতুন পয়গম্বরের দরকার হয়। নতুন কালের উপযোগী করে তিনি নুতনভাবে আল্লাহর নীতিকে ব্যাখ্যা করেন। এই সিলসিলা শেষ হয় এসে রসুল মোহাম্মদ সা.-এর মধ্যে। সব পয়গম্বরই আল্লাহর একই নীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহর তৌহিদের ধারণাকে বুলন্দ করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন। তৌহিদের নীতি হচ্ছে শাশ্বত, কিন্তু কালের ঝোঁক হচ্ছে পরিবর্তনের দিকে। তৌহিদের নীতিকে অক্ষুণ্ন রেখে কালের গতিতে যে মানুষের রুচি, মূল্যবোধ, প্রয়োজন বদলায়, তার স্বীকৃতি ইসলাম দিয়েছে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই যে গতিশীলতার নীতি– এ কালে তার মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লামা ইকবাল তাঁর বিখ্যাত '*ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*' শীর্ষক বক্তৃতাবলিতে। ইসলামের এই গতিশীলতার নীতিকে বলা হয় ইজতিহাদ। ইসলামে পরিবর্তনশীল সময় বা আধুনিক জীবনের টানাপোড়েনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ইজতিহাদ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক জীবনযুদ্ধের নানা রকম জটিলতায় সব রকম সমস্যার সমাধান অক্ষরিক অর্থে কুরআন-হাদিস থেকে না-ও পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এর উত্তর খুঁজতে হয় কুরআনের নীতির ভিত্তিতে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে। ইজতিহাদ হচ্ছে সময়োপযোগী পরিবর্তনের জন্য স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের কৌশল। মুসলিম সমাজে ইজতিহাদের প্রক্রিয়া মোটের ওপর সব সময় চালু ছিল। কালের নানা ঝড়-ঝাপটা তরঙ্গ হয়তো ইসলামকে বিভিন্ন সময় অতিক্রম করতে হয়েছে। সেসময় কারও কারও মনে হতে পারে, ইসলামের কালোপযোগিতা কিংবা যুগোপযোগিতা বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তির মতো সভ্যতারও উত্থান-পতন আছে। মুসলিম সভ্যতাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সেই পতনের প্রান্ত থেকে ইসলাম বারবার শুধু ঘুরে দাঁড়ায়নি; বরং তার সংস্কৃতিরও নতুন বিকাশ ঘটেছে।

এই কারণে তার অন্তর্গত ডায়নামিক্স কখনও অচল হয়ে যায়নি। মুসলিম সমাজ তাই বদ্ধজলা নয়। তার সংস্কৃতিও সৃষ্টিহীন নয়। মুসলিম সংস্কৃতি একটা গতিমান ধারণা।

মুসলিম সংস্কৃতি

মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে আদর্শভিত্তিক। কুরআনে ইসলামকে দ্বীন বলা হয়েছে। দ্বীন মানে হচ্ছে জীবন-দর্শন বা জীবনের একটা সুষ্ঠু আদর্শবাদ। মুসলিম সংস্কৃতি এই আদর্শবাদের ভিত্তিতেই বিকশিত হয়েছে। কোনো কোনো সংশয়ী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যে মত –সংস্কৃতির উত্থানে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই– এই কথা ইসলামের ক্ষেত্রে আদৌ খাটে না। ইসলামের বিপুল জীবনীশক্তি ও তার রসুলের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণেই মুসলিম সংস্কৃতির ফুল ফোটে এবং প্রথমে আরবে, পরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার খুশবু ছড়ায়। এইভাবে ইসলামি আদর্শবাদের ভিত্তিতে মুসলিম সংস্কৃতি আর সেই সংস্কৃতির বুক চিরে মুসলিম সভ্যতার পত্তন হয়। মোহাম্মদ আসাদের মতো বুদ্ধিজীবী মনে করতেন কুরআনের নীতিই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের পূর্বশর্ত। তাঁর ভাষায় :

> Ours was an ideological civilization with the ideology of the Quran as its source, and more than that-for its only justification.[১]

আসাদ আরও উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতার উত্থান ঘটেছে এক অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার মধ্যে এবং এসব সভ্যতার জন্মের মুহূর্তটাকে নির্দিষ্ট করে আঙুল তুলে দেখানো আজ আর সম্ভব নয়। অনেক সভ্যতার উত্থান খুঁজতে হয় কোনো অনৈতিহাসিক মিথ বা কিংবদন্তীর মধ্যে। অনেক সভ্যতা ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়, কিন্তু মুসলিম সভ্যতার ক্ষেত্রে সেরকম অস্পষ্টতার বালাই নেই। আসাদ লিখেছেন :

> The civilization of Islam burst all of a sudden into life, endowed from the very beginning with all the essential attributes of a civilization: a sharply outlined community,

---

১. Muhammad Asad, *This Law of Ours and other Essays*. Gibraltar : Dar Al-Andalus, 1981.

a characteristic world view, a comprehensive system of law, and a definite pattern of social relations. This endowment was due not to many cross-currents and traditions but to a single, historic event: the revelation of the Quran, and to a single historic personality: the Arabian Prophet.[২]

হযরত মোহাম্মদ সা.-এর ব্যক্তিত্বই যে মুসলিম সভ্যতার পত্তনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে মোহাম্মদ আসাদের মতো ইকবালও সেকথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন– ইসলামের নবির ওহিপ্রাপ্তির ঘটনার ভেতর দিয়ে সত্যিকার অর্থে মুসলিম সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়। এ কারণেই ইকবাল দাবি করেছেন, মুসলিম সংস্কৃতি মূলত ধর্মগত সংস্কৃতি। প্রকাণ্ড মুসলিম জগতের পরস্পরের মধ্যে যে মিল তা এই ধর্মগত সংস্কৃতির মিল। সে মিল ইসলামের ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত নিয়মনীতির মিল। আমরা যে 'মুসলিম উম্মাহ' কথাটা বলে থাকি, তা এই ধর্মগত সংস্কৃতির জোরে। আবার যে Brother in religion কথাটা আমরা ব্যবহার করি, তাও একই জোরে। মুসলিম সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ হচ্ছে তৌহিদ। এর অর্থ মানবজীবনে তৌহিদের নীতি প্রতিষ্ঠা এবং এই নীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদের বিকাশ সাধন করা। কথাটা আরেকটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারটা ভাষা, রক্ত, বর্ণ, শ্রেণি, অঞ্চল ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না; এটা গঠিত হয় দ্বীনের ভিত্তিতে। এরা একই দ্বীনের অনুসারী, একই চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ এবং একই লক্ষ্যপথের যাত্রী। এই দ্বীনভিত্তিক সমাজকে পরিচিত করানোর জন্য ইকবাল 'মিল্লাত' শব্দটির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। রসুল সা. এই মিল্লাতকে একটি মানবদেহের সাথে তুলনা করেছেন, যার কোনো অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে পূর্ণ দেহটিই ব্যথায় জর্জরিত হয়ে ওঠে।

রসুল সা.-এর ইন্তেকালের পর দীর্ঘ ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় ইসলামকে নানা উত্থান-পতন, টানাপোড়েন, কলহ-বিবাদ, গৃহদাহের মতো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। শিয়া-সুন্নিতে কলহ হয়েছে। শাফেয়ি, হানাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মাযহাবিতে বিস্তর বিবাদ-বিসংবাদের মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মুতাজিলা, জাবরিয়া, কাদরিয়া,

২ Ibid.

কারামতিয়া, ইসমাইলিয়া, আশারিয়া ইত্যাদি নানা মতের আবির্ভাব ইসলামের মধ্যে হয়েছে। সুফি, দরবেশ, পীরদের ভিন্ন ভিন্ন তরিকা-সাধনপদ্ধতির বিকাশ হয়েছে, আবার এদের সাথে শরিয়তপন্থিদের ঝগড়াও চলেছে। স্বার্থের কারণে মুসলিম রাজা-বাদশাহতে বিস্তর খুনোখুনিও হয়েছে। তবুও বলতে হবে– অন্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মে কোনো অস্পষ্টতা নেই। খুবই পরিষ্কার, সুস্পষ্ট। এর নড়চড় হওয়াও শক্ত। কোনো কিছুই এর পরিবর্তন ঘটেনি। মুসলিম ধর্মমত অনেকাংশেই একরূপ রয়ে গেছে। এর কারণ, এর মূল বুনিয়াদ হচ্ছে তৌহিদ, যার ব্যাপারে ইসলাম নড়চড় কিংবা একটুও আপস করেনি। এই কারণেই ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়। এটি সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়ার স্পর্ধা রাখে। সেই হিসেবে ধর্মগত বিচারে এর কোনো ন্যাশনাল ক্যারেক্টার নেই, পুরোটাই আন্তর্জাতিক। এর চেহারা তাই পুরোপুরি সর্বজনীন।

এতো গেল মুসলিম সংস্কৃতির ধর্মগত দিক। ধর্মগত দিকের বাইরে এই সংস্কৃতির একটা পরিবেশগত দিকও আছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের মনন বৈশিষ্ট্যে ছাপ ফেলে। তার ফলে সংস্কৃতির মধ্যে দেশে দেশে রূপভেদ দেখা যায়। এই পরিবেশগত সংস্কৃতির তাই একটা জাতীয় রূপ থাকে। এইভাবে ইসলাম একই সঙ্গে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সাধনা করেছে। ইসলাম যখন চীন, জাভা, মালয় থেকে বোখারা, ইস্পাহান, মরক্কো, ইস্তাম্বুল, আলবেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তখন বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের সৃষ্টিধারা ও জীবনধারা একইভাবে প্রবাহিত হয়নি। এই রূপ-বৈচিত্র্যকে ইসলাম মেনে নিয়েছে।

বলা চলে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির কারণে মুসলিম সংস্কৃতির বিপুল বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। স্পেনের মুরদের সৃষ্টিধারা, ভারতে মোঘলদের সৃষ্টি, মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের সৃষ্টি, তুর্কিদের সৃষ্টির মধ্যে বিস্তর রূপভেদ আছে। মুরদের স্থাপত্যের সাথে তুর্কিদের স্থাপত্যের রূপভেদ ঘটেছে। ইরানি কবিরা যেখানে ইসলামের মরমি সাধনার দিকে ঝুঁকেছেন, আরবি কবিরা সেখানে রণ-দামামার ছবি এঁকেছেন। আবার দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মারফত কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে পরিবেশের কারণে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, জীবনের

উপায়-উপকরণের ব্যবহারের মধ্যে ঘটেছে তফাত। এই তফাতের কারণে দেশে দেশে মুসলিম সংস্কৃতির যে বাইরের রূপভেদ ঘটেছে, তা কিন্তু ইসলামবিরোধী নয়। দেখতে হবে, পরিবেশগত মূল্যবোধ ইসলামি ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা কিংবা ইসলামি ভাবধারার বিপরীত মূল্যবোধ এটি ধারণ করে কিনা। কেউ আরবিতে কথা বললেই যেমন তা ইসলামি হয়ে যায় না, তেমনি ভিন্ন পরিবেশে বা ভাষার মারফত সংস্কৃতি চর্চা করেও তা মুসলিম সংস্কৃতির বাগানে ফুল ফোটাতে পারে। অনেক মুসলমানের সন্তানরাই আজকাল মার্কসের চর্চা করছেন কিংবা পশ্চিমি মূল্যবোধের অনুগ্রাহী হয়ে উঠেছেন, তাই বলে তো একে আর ইসলামি পদবাচ্য বলা যাবে না। ইসলামের তৌহিদের বিরোধী নয় এবং মানব-মনের সর্বজনীনতার দিকগুলো তুলে ধরে এরকম সবকিছুই ইসলামি সমাজে গৃহীত হতে পারে। আটশ বছর হলো ইসলাম বাংলাদেশে এসেছে। ইসলাম অনুসারীরা এই ভূখণ্ডের অনেক জীবনাচার, উপায়-উপকরণ, খাদ্যাভ্যাস রপ্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম যা নেয়নি তা হলো– এই ভূখণ্ডের প্রাক-ইসলামিক শিরক-বিদআত আর দেবপূজা, দেবমন্দিরের সংস্কৃতি।

আবার সপ্তম শতাব্দীর মুসলিম সমাজের সাথে আজকের মুসলিম সমাজের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর মুসলিম সমাজ এখন আর কোথাও অব্যাহত নেই। কালগতিতে মুসলিম সমাজের অনেক পরিবর্তন এসেছে। এ কালের, এ যুগের সভ্যতার অনেক দানই আমরা গ্রহণ করেছি। এর অনেক কিছুই পশ্চিমি সভ্যতার দান– যা তাদের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার ফসল। এই উৎকর্ষতার অনেক কিছুই ইসলাম নিয়েছে, কিন্তু যা নেয়নি তা হলো– পাশ্চাত্য সভ্যতার একালের সেক্যুলার ভিত্তিকে। কারণ, এটি তার তৌহিদের পরিপন্থি।

দেশ, কাল ব্যতীত শ্রেণিভেদে, অর্থনৈতিক কারণে সংস্কৃতির রূপভেদ ঘটেছে। মুসলমান চাষীর কালচার আর মুসলমান আমির-ওমরাহদের কালচার একই ধারায় অব্যাহত থাকেনি। ধর্মীয় নীতিতে ইসলাম সমদর্শী বা সমরূপী হলেও আমাদের আত্মস্বার্থপরতার কারণে এই বিভাজন ঘটেছে এবং একজনকে অধিকারবঞ্চিত করে অন্যের স্ফীতি ঘটেছে। এটা ইসলামি নীতির পরিপন্থি এবং ইসলামকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ফল।

মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের ধারা

মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয় আরবের মরুভূমিতে। সেই সপ্তম শতাব্দীতে এই সংস্কৃতি ইসলামের অভূতপূর্ব জীবনীশক্তি ও তার পয়গম্বরের প্রেরণাদায়ক নেতৃত্বে যে বিপুল প্রাণশক্তিতে জেগে উঠে, তা দেখলে বিস্ময় জাগে। পয়গম্বরের ইন্তেকালের একশ বছরের মধ্যে মুসলিম বিজয়ের তুফান যেভাবে সমস্ত রাজ্য, রাজা, রাজধানী ও সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়– তা এক তুলনাবিরহিত ঘটনা। শুধু ভূখণ্ড বিজয়ের মধ্যে মুসলমানদের প্রাণশক্তি সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা বিজিত জাতিদের নিয়ে এক চমৎকার সভ্যতা গড়ে তোলে– যা দেখে একালের মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল পণ্ডিতই অবাক হয়ে যান।

মরুভূমির বিজেতা মুসলমানরা এভাবে নানা জাতির সংস্পর্শে আসে। গ্রিক-রোমান সভ্যতার সমৃদ্ধি, ইরানি-ব্যাবিলিনীয় সভ্যতার দান, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির তারা খোঁজ পেয়ে যায়। এভাবে মুসলমানরা নিজেদের প্রাণশক্তি ও অর্জিত বৈভব দিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টিতে মেতে ওঠে। তারা বাইজেন্টাইনদের স্থাপত্যের সাথে পারসিক, মিশরি, তুর্কিস্তান ও ভারতবর্ষীয় গঠন-কাঠামো মিলিয়ে অপূর্ব সব মসজিদ, মাজার, রাজপ্রাসাদ তৈরি করে– যার পেছনে থাকে ইসলামের অনন্ত সৃষ্টির প্রেরণা। বাগদাদি খলিফাদের প্রেরণায় একদিকে শুরু হয় দর্শনের চর্চা, অন্যদিকে ভূখণ্ড বিজয়ের পর আসে মুসলমানের বিজ্ঞান বিজয় ও বিজ্ঞান অনুশীলনের যুগ। একদিকে কিন্দি, ফারাবি, ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালি, ইমাম বুখারি শুধু দর্শন ও শাস্ত্রের বিকাশে মন দিলেন না; একে রূপান্তর করে মুসলিম জ্ঞান-জগতে ফুল-ফসলের সমারোহ সৃষ্টি করলেন, অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূর্তবিদ্যা, নৌবিদ্যা, স্থাপত্যে যেন সৃষ্টির জলতরঙ্গ বয়ে গেল। আবার আর্থিক প্রয়োজনে মুসলিম সভ্যতায় ব্যাবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, হুন্ডি, চেক প্রভৃতিও প্রচলিত হয়। যৌথ কারবারের প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্ধপৃথিবীর জ্ঞানকেন্দ্র ও বিদ্যাকেন্দ্র ছিল দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো ও স্পেন।

এসব কেন্দ্রের আশেপাশে আরও কয়েকটি কেন্দ্র বিভিন্ন সময় ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফুল ফুটিয়েছে। যেমন : ইস্পাহান, বোখারা ও দিল্লি। এই মুসলিম সভ্যতার কাছে পৃথিবী এত বিপুলভাবে ঋণী এবং সেই ঋণ

এত বেশি স্বীকৃত হয়েছে যে, তা সর্বজনবিদিত। (দেখুন, আমির আলীর *History of the Saracens*. পি. কে. হিট্টির *History of the Arabs*. আর্নল্ড টয়েনবির *The Preaching of Islam*. এম. এ. শুস্তারির *Outlines of Muslim Culture*, *Arnold* ও *Guillume* সম্পাদিত *The Legacy of Islam* প্রভৃতি।)

তবু রিলিজিয়ন হিসেবে ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি বলতে হয়, তবে বলতে হবে– এর সরল অথচ দৃঢ় তৌহিদ বা একেশ্বরবাদের ধারণা এবং সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সার্বজনীন সাম্যবাদ। উৎপীড়ন থেকে, জুলুম থেকে, অসত্যের কালো ছায়া থেকে ইসলাম ধর্মের আশ্বাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মজলুম মানুষ মুক্তির আনন্দে উদ্বেল হয়েছে। ইসলামের বিজয় অভিযানের মূলে এটিই ছিল প্রধান কারণ। শুধু তরবারি দিয়ে অর্ধপৃথিবী শাসন করা যায় না। সিরিয়ায়, মিশরে, স্পেনে, পারস্যে, ভারতে যেখানেই ইসলাম গিয়েছে সেখানেই উৎপীড়িত প্রজাকুল ধনিক ও যাজক সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির পথ হিসেবে ইসলামকে খোশ আমদেদ জানিয়েছে। আমাদের এই বাংলাদেশে বখতিয়ার খিলজির ১৭ অশ্বারোহী নিয়ে বিজয়াভিযান কখনোই সম্ভব হতো না, যদি না সেন ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে জর্জরিত বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মকে মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করত।

আধুনিক মুসলিম সংস্কৃতি

রবার্ট ব্রিফল্টের মতো বহু পণ্ডিত স্বীকার করেছেন, ইউরোপে রেনেসাঁর প্রেরণা এসেছিল ইসলাম থেকে। স্পেনের ভেতর দিয়ে মুসলিম জ্ঞানচর্চার ধারা গিয়ে মূল ইউরোপকে ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কায় ইউরোপ জেগে ওঠে। একসময় দেখা গেল, মুসলমানদের কাছ থেকে ধার করে ইউরোপ এগিয়ে যায়। আর সভ্যতার চালক মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে। কারণ, তাদের ভেতরকার বুদ্ধিমত্তা-সৃজনশীলতার ধারা শুকিয়ে যায়। এই এগিয়ে যাওয়া ইউরোপ একসময় আগ্রাসী ভূমিকায় হামলে পড়ে মুসলিম জগতের ওপর। এভাবে মুসলিম জগতে মধ্যযুগের অবসান হয়; আসে আধুনিক যুগ।

এ আধুনিক যুগ ইউরোপের যুগ– যেখানে ইউরোপের ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ মুসলিম দুনিয়াকে তছনছ করে দেয়, মুসলিম সমাজে পরিকল্পিতভাবে ফাটল ধরায়, তার সংস্কৃতি দূষিত হয়ে পড়ে।

আধুনিক কালের এই স্তরে এসে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম জগতে ধর্মগত কালচার বাদ দিয়ে এক জাতিগত কালচার বিকাশের চেষ্টা চালায়। এ কাজে সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতা করে ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনায় প্রাণিত একদল বুদ্ধিজীবী, লেখক, রাজনীতিবিদ– তাদেরই স্বার্থে, তাদের গদি ও অবস্থান টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। গত একশ কী দু'শ বছরে মুসলিম দুনিয়ায় সচেতনভাবে জাতির বুনিয়াদে আরবি, ইরানি, তুর্কি, বাঙালি প্রভৃতি জাতির নিজ নিজ সংস্কৃতি বিকাশের চেষ্টা হয়। জাতীয়তাবাদ সীমিত অর্থে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আর্থিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে কল্যাণকর হতে পারে, কিন্তু ব্যাপক অর্থে জাতীয়তাবাদ জন্ম দেয় জাতিবিদ্বেষ– যার সাথে সাম্প্রদায়িকতার কিছুমাত্র তফাত নেই। এই কারণেই দেখি, আধুনিককালে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় চেতনা বিশ্ব মুসলিমকে মেলাতে পারেনি। একালে জাতিগত কালচারের প্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় কামাল পাশার তুরস্কে। তারপর ইরানে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। এই জাতিগত কালচার সবদেশেই কোনো না কোনোভাবে এ কালে মুসলমানের ভাবসংকট, সংস্কৃতির সংকট, আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে। এর ফলে মুসলিম সমাজে একধরনের টানাপোড়েন, অবিশ্বাস, ফাটলের জন্ম হয়েছে। এতকাল যে দ্বীনের প্রেরণা মুসলিম সমাজকে এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন সংহতি জোগাত– তা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অবশ্য এই জাতি-চেতনার কুয়াশার মধ্যে সাম্প্রতিককালে মুসলিম ভাবজগতে এক নতুন তরঙ্গের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আধুনিক যুগের জাতি-চেতনার মোহপাশ কাটিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা ইসলামকে বুনিয়াদ করে নতুনভাবে সংস্কৃতি ও জাতি-চেতনার বিকাশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব লক্ষণ বেশি প্রস্ফুটিত হতে পেরেছে মুসলিম দুনিয়াজুড়ে আজ যে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা-সমাজব্যবস্থার দাবি উঠেছে, যে আন্তর্জাতিক মুসলিম সমাজশক্তি জেগে উঠার সম্ভাবনায় দোলা দিচ্ছে, তার ভেতর। এইভাবে একালে মুসলিম কালচারের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নির্দেশ ও সত্যিকার সাক্ষ্য এই নব অভ্যুত্থানকামী (Resurgent) ইসলামের মধ্যেই পরিলক্ষিত। এই রিসার্জেন্ট ইসলাম নিয়ে আজ পশ্চিমের মাথাব্যথা। কারণ, ইসলাম এই আন্দোলনের প্রবক্তাদের পরিচয় জোগাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে মুসলিম দুনিয়ায় জাতি-চেতনার মূল্যবোধ হ্রাস পাবে।

সেক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়া নিয়ে পশ্চিমের খবরদারি কমতে বাধ্য। এই জন্যই পশ্চিমের কর্তা ব্যক্তিদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে এবং তারা রিসার্জেন্ট ইসলামের প্রবক্তাদের চরিত্র হননে মেতে উঠেছে। রিসার্জেন্ট ইসলামের প্রবক্তারা নিছক ভাগ্যবাদী নন কিংবা মধ্যযুগীয় নন; তারা যুগ-সমস্যাকে যুগের আলোকে ও ইসলামি নীতির আওতার মধ্যে সমাধান করতে চান। তারা বিরাট মুসলিম সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে জ্ঞানচর্চার ধারাকে মুসলিম সমাজে ফিরিয়ে আনতে চান এবং বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মুসলিম সমাজের জড়তা ভাঙতে চান। স্রেফ ইউরোপীয় আধুনিকতার অনুবর্তী না হয়ে ইসলামের নিজের মতো করে আধুনিক হওয়ার যে অন্তঃশক্তি ও সম্পদ আছে, তাকেই তারা ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। জাতীয় চেতনার তারা বিরোধী নন, কিন্তু এই চেতনার বিকাশ ইসলামি ভাবধারার আওতার মধ্যে হওয়া চাই। দেখতে হবে– জাতীয় ভাবধারা যেন ইসলামকে অতিক্রম না করে। এ কারণেই আজকের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন বেশি। 'উম্মাহ'র যে প্রকৃত স্পিরিট, তার ভিত্তিতেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। এটা না হলে মুসলিম সমাজের সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না। রিসার্জেন্ট ইসলামের প্রবক্তারা এভাবেই আজ মুসলিম সমাজের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা ভাবছেন।

বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি

আটশ বছর হলো ইসলাম এ দেশে এসেছে। ইসলাম ধর্মের সাম্যবাদী প্রবণতা সেদিনকার দরিদ্র ও নিষ্পেষিতদের কাছে টেনেছিল। হিন্দু রাজশক্তির আধিপত্য ও হিন্দু সমাজের নিপীড়ন থেকে বাঁচবার জন্যে বাঙালি জনসাধারণের এক বৃহদংশ এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। আগেই বলেছি, ধর্ম হিসেবে ইসলাম সাম্যের পক্ষপাতী। অন্যদিকে হিন্দু ধর্ম বৈষম্য ও অধিকারভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে ইসলাম এ ভূখণ্ডে অধিকারহীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে এবং ধর্মের খাস জমায়েতে সকল মানুষকে জায়গা করে দেয়। সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসে শ্রেণি নির্বিশেষে এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে বড়ো অবদান।

এ দেশে ইসলাম আসার পর প্রথমে স্বাধীন সুলতানরা, পরে মোঘলরা রাজত্ব করে। এই সময়কে ইতিহাসবিদরা মধ্যযুগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পুরো মধ্যযুগ জুড়ে ইসলামি মূল্যবোধ, জীবনভাবনা, জীবনচেতনা, সামাজিক ব্যবহার বিধি, আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, রাজনৈতিক প্রশাসন ও বিশিষ্ট শিল্পচর্চা এ দেশে বিকাশ লাভ করে। বাংলা ভাষার রূপরীতিতে পরিবর্তন আসে এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল মুসলিম সমাজের ছবি ফুটে উঠতে শুরু করে। এক কথায় বলতে গেলে– ইসলাম এ দেশের গণজীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করে এবং এখানকার সমাজব্যবস্থার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। দেশে দেশে নগরকে কেন্দ্র করেই এই সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বখতিয়ার খিলজি আসার পর এখানে নতুন নতুন নগর প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। সেই নগরকে কেন্দ্র করে যেমন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়, তেমনি এ দেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের জীবনধারায় পরিবর্তন আসতে থাকে। নগরায়ণের সাথে সাথে স্থাপত্যশিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন হয় এবং প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বড়ো বড়ো ইমারত, মসজিদ ও দুর্গের স্থাপত্যরীতির বিকাশ হয়। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বড়ো বড়ো মাদরাসা, ধর্ম সাধনার জন্য খানকাহ স্থাপিত হয়। স্থাপত্য কলা, নগরায়নের দিকে মুসলিম রাজশক্তির ঝোঁক যে বরাবর একটু বেশিই ছিল বাংলাদেশে তার প্রমাণ মেলে গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। তবে মধ্যযুগে মুসলিম মানসসৃষ্টির প্রধান পরিচয় মেলে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। যদিও দরবারের ভাষা ফারসি এবং ধর্মের ভাষা আরবি হওয়ার কারণে মুসলমান জ্ঞানী-গুণী-আলেমরা প্রভূত আরবি-ফারসি চর্চা করতেন, তারপরেও মুসলমান সুলতান, আমির, ওমরাহরা দেশি ভাষা চর্চায় বিপুল উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং ধর্ম নির্বিশেষে জনগণকে এই কাজে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এই কারণেই দেখি গৌড়ের দরবারে, রোসাঙ্গের রাজসভায়, লস্কর পরাগল খাঁ-র বৈঠকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে।

মুসলমানরা আসার আগে হিন্দু রাজারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাকে রাজদরবার ও মন্দিরের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। এতে ব্রাত্যজনের কোনো অধিকার ছিল না। মুসলমানরাই প্রথম জনজীবনভিত্তিক একটি নতুন সংস্কৃতির বুনিয়াদ প্রস্তুত করেন এবং শিল্প-সাহিত্যকে এই

প্রথম মানবতাভিত্তিক উপাদানে ভরিয়ে তোলেন। মুসলিম আমলে বাংলাভাষা চর্চার যেমন পরিবেশ তৈরি হয়, তেমনি নতুন ধর্মের প্রভাবে এর রূপ-রীতির পরিবর্তন ঘটে। এর ভেতরে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের আমদানি হয়। এইভাবে বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলার মধ্যযুগের মুসলমানদের এই ইতিহাস কোনো ঠুনকো ঘটনা নয়। এটা কয়েকশ বছর ব্যাপী একটি সংস্কৃতি নির্মাণের ইতিহাস। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়– এটা হলো বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতির একটি বাঙালি রূপ। ইতিহাস হিসেবে এ এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির ইতিকথা। যেসব পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী বাংলায় ইসলামের আগমনকে একটা দুর্ঘটনা হিসেবে চিন্তা করেন, ইসলামের আগমনকে সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের সাথে মিলিয়ে দেখায় উৎসাহ বোধ করেন, তারা ইসলামের এই সামাজিক প্রগতির দিকটা কখনও ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় না।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারের কারণ হচ্ছে, এটি এক প্রচণ্ড আত্মস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ধর্ম। ইসলাম আসার আগে ভারতের দুয়ার ভেঙে বহু ধর্ম, ভাষা, জাতির লোক এখানে ঢুকে পড়েছে। তাদের প্রবেশকেও ভারতীয়রা প্রতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু যা হয়েছে, ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যে তারা মিশে গেছে। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রেই ঘটে ব্যতিক্রম। ইসলাম অনুসারীরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিশে যায় না, মিলে যায় না। তারা এ দেশীয় পরিবেশে নতুন এক সংস্কৃতি নির্মাণ করে। ভারতীয় সংস্কৃতি তাই মুসলমানদের আত্মসাৎ করতে পারেনি। কারণ, ইসলাম ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়। একদিক থেকে বলা যায়– ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি ধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটে ইসলামের আত্মসচেতনতার কাছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও ভারতবর্ষে থেকে ইসলাম এখানে নিমজ্জিত হয়ে যায়নি; উলটো মুসলমানরা ভারতবর্ষের একটি ইসলামি রং তৈরি করে নেয়। বহুকাল ধরে আমরা যে মুসলিম ভারত ও মুসলিম বাংলা কথাগুলো শুনে থাকি, তা হচ্ছে এই সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

আরেক দল পণ্ডিত মনে করেন, ভারতের সাথে এই যোগাযোগের ফলে ইসলামও কিছুটা ভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানকার মানুষ এই নতুন ধর্মকে কিছুটা তাদের পূর্বপরিচিত জিনিসের আধারে ঢেলে সাজিয়ে নেয়।

এর ফলে নিরঞ্জন হন আল্লাহ, হিন্দু দেবতারা হন মুসলমান পীর, বৌদ্ধ স্তুপ হয় দরগাহ, দেবপূজা মাজারপূজায় এবং পুরাতন দেবলীলার কাহিনি পীর-মুর্শিদের কেচ্ছায় পরিণত হয়। এসব কথার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে, কিন্তু এই রূপ ইসলামের আসল চেহারা নয়। কালে কালে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামের মধ্যে এসব প্রথা-পদ্ধতি ঢুকে পড়েছে। এই জন্যই ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের মধ্যে বারবার সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে। মুজাদ্দিদ আলফে সানি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ থেকে শুরু করে ওহাবি, ফরায়েজিদের আন্দোলন তো একপ্রকার সংস্কার আন্দোলনই। এসব আন্দোলনের একটা উদ্দেশ্য ছিল– ইসলামের ওপর আপতিত যুগ-যুগান্তের আবিলতা ঝেড়ে-পুছে এর মৌলিক পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনা।

স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবের সূত্রে ভারতে ইসলামের জনগ্রাহ্যরূপের আরও একটা উদাহরণ কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী উল্লেখ করেন। রামানন্দ, দাদু, কবীর, নানক; আমাদের দেশের চৈতন্য, লালন ফকিরের প্রচারিত ভক্তিবাদ ও মানবসমাজের ধারণা নাকি ইসলামেরই একটি প্রাকৃত ও লোকজ রূপ। এ কথাটার মধ্যে সত্যের চেয়ে ভুলের পরিমাণ বেশি। ইসলাম মূলগতভাবে সাম্যবাদী ধর্ম। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা। এজন্য দাদু, রামানন্দ, চৈতন্যের ভক্তিবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের আত্মরক্ষার প্রয়োজন কী? মূল কথা হচ্ছে– এ দেশের জনসমাজে ইসলামের সাম্যবাদী ধারণা প্রসারের ফলে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সাড়া পড়ে যায়। এই ধর্মান্তর ঠেকানোর জন্য এসব ভারতীয় সাধক সন্ন্যাসীরা ইসলামের সাম্যের ধারণাকে আত্মস্থ করে ভক্তিবাদ প্রচার করেন এবং অধিকারবঞ্চিত মানুষকে সেখানে আশ্রয় দেওয়ার আশ্বাস দেন। আসলে এরা ভক্তিবাদের আড়ালে হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার লড়াই শুরু করেছিলেন। আমাদের এখানকার কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর লেখা পড়লে মনে হয়, শ্রী চৈতন্য বোধ হয় এ দেশের মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। এটা একটা অনৈতিহাসিক কথা। শ্রী চৈতন্য কোনো সমন্বয়ী ধর্ম প্রচার করেননি। তিনি হিন্দু ধর্মকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে রক্ষা করেছিলেন মাত্র। এ দেশের নিপীড়িত মানুষকে উদ্ধার করেছিল ইসলাম। এখানে তার সমকক্ষতা দাবি করার স্পর্ধা কারও নেই।

এ ছাড়াও বাংলার লোকজীবনে মুসলমানের দান কতভাবে যে ভরে উঠছিল, তা লিখে শেষ করা যাবে না। সেই কৃষি সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের ধারা শুরু হলো। জমিজমার বন্দোবস্ত, খাজনার হিসাবপত্র মুসলমানি কায়দায় শুরু হলো। ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির রূপ এই ভূমিব্যবস্থায় অনেকখানি পরিস্ফুট। জীবনযাত্রায় এলো পরিবর্তন। শহরে, বাজারে, দোকানপত্রে, প্রতিদিনের জীবনে মুসলিম দানে ভরে উঠল। বাগিচার কালচার, ফুল, খশবু, গোলাপপানি, শরবতের ব্যবহার বাড়ল, সূচিশিল্পের কদর দানি হলো। সেলাই করার নিয়ম এ দেশের মানুষ জানত না। মুসলমানরাই দরজি পেশার পত্তন করে। নানা রকম ডিজাইন ও নকশার কাপড় প্রস্তুত হতে লাগল। কাগজ এ দেশে মুসলমানরাই আনে, তারপর কিতাবের কদর বাড়ে। অসংখ্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই যে গৌরবজ্জ্বল সংস্কৃতি মুসলমানরা গড়ে তুলেছিল, তার পাশে আজকাল আমরা ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয় বা বাঙালির যৌথ উত্তরাধিকারের কথা শুনি। হিন্দু-মুসলমান বাঙালির যৌথ সংস্কৃতি ও সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথাও কানে আসে আমাদের। এই যৌথ সংস্কৃতি বলে আদৌ কি কিছু আছে? বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তার মতে– বাংলায় হিন্দু আর মুসলমানদের সংস্কৃতি এক নয়। কারণ, এক নয় তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাসের ধারা। তাদের সংস্কৃতিরও বিবর্তন হয়েছে ভিন্নভাবে। এই কারণেই তিনি তার বইয়ে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির কথা ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। তার এ বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বাস্তবধর্মী। একটা কথা বোঝা দরকার, আজকের বাংলাদেশ এখানকার বাঙালি মুসলমানদের সংগ্রামের ফসল। ইতিহাসের বিবর্তনে বাঙালি মুসলমানরা পৃথক রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা তখনই হয়, যখন একটি জনসমাজ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য তারা কালক্রমে একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি নিয়ে দাঁড়ায়। গত শতকের চল্লিশের দশকে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্বের কথাটা উঠেছিল, তার প্রেক্ষাপট কিন্তু একদিনে রচিত হয়নি। এই দীর্ঘ আটশ বছরে ভারতীয় জনসমাজে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির কোঠাটি যে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিল, তারই পরিণতি হচ্ছে দ্বিজাতিতত্ত্ব।

এই তফাতটা বেশি চোখে পড়তে শুরু করে– যখন মুসলিম আমল শেষ হয়ে যায় এবং এদেশ ইংরেজের দখলে আসে। এইভাবে মুসলমানের সৌভাগ্যের দিন অস্ত যায়। আর ইংরেজের কৃপায় হিন্দুদের সৌভাগ্য বাড়তে থাকে। ইংরেজরা আসার আগে মুসলিম সুলতান, নওয়াব, সুবাদাররা সংস্কৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে ইংরেজরা এ দেশের কর্তৃত্ব কবজা করার জন্য মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দাবানোর চেষ্টা করে। সে কাজে ইংরেজের সঙ্গী হয় হিন্দুরা। তাই দেখি পুরো উনিশ শতক জুড়ে মুসলমান বাঙালির এক বিদ্রোহী রূপ। স্বাধীনতা আর স্বধর্মের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই আজ এক গৌরবময় ইতিহাস। এ ইতিহাসের খবর পাই আমরা ব্রিটিশ আমলা হান্টার সাহেবের রিপোর্টে। পুরো উনিশ শতক তাই মুসলমানদের কেটেছে বিদ্রোহে, ধর্মান্দোলনে, লড়াইয়ের ময়দানে, ফলে সৃষ্টি-চেতনার দিক দিয়ে মুসলমানদের ভূমিকা ক্ষীণস্রোতা হয়ে যায়।

অন্যদিকে ইংরেজের শরিক হিন্দুরা নতুন সৌভাগ্য লাভে এগিয়ে যেতে শুরু করে। ইংরেজের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তারা পরিপুষ্টও হয়ে ওঠে। এইভাবে তারা একটি বিকাশমান জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে– যা কিনা হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের কাঠামোকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়। এই নবজাগ্রত বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা একই সাথে ইংরেজের ইন্ধনে স্বভাষী বাঙালি মুসলমানকেও পর করে দেন এই ভেবে, ইসলাম যেহেতু বিদেশি, তাই এর অনুসারীরাও বিদেশীয়। তখনকার মতো তারা হিন্দুত্ব ও হিন্দু রীতি-নীতিকেই জাতীয় ধারা হিসেবে গ্রহণ করে। ভারতীয়ত্ব বা বাঙালিত্বের সাথে বাঙালি হিন্দুরা তখন হিন্দুত্বকে মিলিয়ে দেয়। এইভাবে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক হিন্দু জাতীয়তাবোধের উত্থান ঘটে, তার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে জন্ম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের। ইতিহাসের দিকে যাদের চোখ আছে, তারা জানেন এই জাতীয়তাবাদের ভাগাভাগি শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগাভাগিতে গড়ায়।

আমাদের ভাবী সংস্কৃতির ভিত্তি

কলোনির চাপে ও তাপে মুসলিম সংস্কৃতির পাটাতনটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল ঠিক, কিন্তু মুসলমানের প্রবল আত্মস্বাতন্ত্র্যপরায়ণতা সব রকমের প্রতিকূলতার মুখে সেদিন তাদের টিকিয়ে রেখেছিল। বাংলাদেশের যে

রাজনৈতিক সীমানা আজ অর্জিত হয়েছে, তা কিন্তু দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনার ভেতর দিয়েই প্রস্তুত হয়েছে। একভাবে বলা যায়– এই দেশভাগের ঘটনাও ছিল এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতার ফল।

যাহোক, বাংলা তথা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির জন্ম হয় এবং নানা রকমের রাজনৈতিক স্বার্থ, সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ফাক গলিয়ে এখানকার মানুষের ধর্মীয় সত্তা ও ভাষা সত্তার মধ্যে কাটাকুটি শুরু হয়। এই কাটাকুটির পথ ধরেই সিকি শতাব্দীর অবসান না হতেই পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসে এবং তারা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। যা ভাবা হয়েছিল, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এক স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণ করতে পারবে, তা কিন্তু তারা পারেনি। জন্মের পর থেকে এই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের এক দোলাচল মানসিকতার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এর কারণ, ধর্ম ও সংস্কৃতি তথা ভাষার মধ্যে একধরনের দ্বিধাবিভক্তির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই যে আত্মপরিচয়ের সংকট, তা কিন্তু বাংলাদেশের জনসমাজের মধ্যে নানা রকম টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে আবৃত করে ফেলতে চায়। এই সংকটের কারণ হলো– আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের চরম অদূরদর্শিতা, অযোগ্যতা, উপনিবেশিক মানসিকতা, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কর্তৃত্ব ও খবরদারি এবং তার ফলস্বরূপ জনসমাজের চরম অনৈক্য। আমাদের নেতৃত্বের আত্মস্বার্থপরতা এত দূর উদগ্র হয়ে উঠে যে, তা কখনও কখনও জাতীয় স্বার্থকেও অতিক্রম করে। এই সংকটের ভেতর এখন আবার এগিয়ে আসছে বিশ্বায়নের থাবা। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও মিডিয়ার অস্ত্র দিয়ে এখন আমাদের সমাজকে বিশ্বায়ন তছনছ করে ফেলতে চাইছে এবং এক মনোজাগতিক উপনিবেশ গড়ে তুলবার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাঙালি মুসলমানকে আজ চারিদিক থেকে এই রকমের নানামুখী সংকট টানছে এবং সেই টানাটানির মুখে পড়ে তারা আজ রীতিমতো দিক-দিশা হারিয়ে ফেলছে।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদেরই প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের বিরাট একটি অংশ বুদ্ধিজীবীতার নামে যা প্রচার

করেন, তা একই সাথে কলকাতাকেন্দ্রিক ও পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার সংমিশ্রিত রূপ এবং কখনও কখনও স্রেফ চর্বিত চর্বণ। আমাদের এই মুসলমানপ্রধান সমাজে এই সব চিন্তা-ভাবনা কখনোই গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। উলটো জোর করে চাপিয়ে দিতে গিয়ে সামাজিক অস্থিরতাকে গভীর করা হয়েছে। মুসলিমপ্রধান একটি সমাজকে জাগাতে হলে চাই তার শিকড় ধরে টান দেওয়া। তার মানসভুবনে ধার করা পশ্চিমি ও কলকাতাকেন্দ্রিক চিন্তার রাজপাট খতম করে ইসলামের অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠা করা।

বাঙালি মুসলিম মানস পরিমণ্ডলে আজ নানা বৈদেশি খাদ ও আবর্জনা মিশে গেছে। সেই খাদের ভারে মুসলমান নিজেই নুইয়ে পড়েছে। বাঙালি মুসলিম মানস পরিমণ্ডলকে পুরোপুরি শোধন করে সেখানে ইসলামের আলো বিকিরণ করাতে হবে– যাতে অতীতের দুর্বলতা পুরোপুরি মুছে যায়। এজন্য দরকার বাঙালি মুসলমানের আরও আরও নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় সে যদি পুষ্ট না হতে পারে, তবে সে কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না। পারবে না কোনো প্রগতিমূলক আন্দোলনের জন্ম দিতে, এমনকি আধুনিক বিশ্বের সামনে নির্ভয় চিত্তে কখনও দাঁড়াতেও পারবে না। ইসলামের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য, বিজ্ঞানানুশীলনের ধারা, যুগ সমস্যার সমাধানে ইসলামের সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ, তার জাগ্রত ও বিপ্লবী মানবতাবাদ সর্বোপরি উম্মাহর চেতনা– এই হবে ভাবীকালের বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ভিত্তি। এইভাবে বাঙালি মুসলমান তার নিজের শক্তির উদ্বোধন ঘটাবে; একই সাথে বিশ্ব মুসলমানের সাথে নিজের প্রাণের যোগ সাধন করবে। যতকাল মুসলমানরা ইসলামকে সংস্কৃতি হিসেবে নিয়েছে, ততদিন সৃষ্টিশীলতা ও প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাব হয়নি। যখন ইসলামকে তারা Ritual বানিয়ে চর্চা করতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে অবক্ষয়ের লক্ষণ সূচিত হয়। বাঙালি মুসলমানকে আজ তাই তার সংস্কৃতি গড়তে হবে ইসলামি কাঠামোর ছাঁচে। সেটিকে তাদের Ritual হিসেবে নয়, সংস্কৃতি হিসেবে চর্চা করা চাই। তাহলেই তাদের মুক্তির লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হবে।

বাঙালি কাকে বলে

এক.

বাঙালি ও বাঙালিত্বের সত্যিকারের সংজ্ঞা ও রূপ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনো বুদ্ধিজীবী আমাদের তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারেননি। তবে এক্ষেত্রে বলা যায়– বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার-প্রসারে আয়োজনের কিন্তু কমতি নেই কোথাও। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে আবহমান বাংলা, হাজার বছরের বাঙালি, বাঙালি সংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যযুক্ত প্রচার-প্রোপাগান্ডার বাহক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই সব শব্দের অর্থ কী? এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা আমাদের কীসের ইঙ্গিত দেয়? হিন্দু ও মুসলমান সত্তার উর্ধ্বে তৃতীয় কোনো সত্তা আছে কি? থাকলে এর স্বরূপ কী? অর্থাৎ সেই বাঙালিত্ব জিনিসটা কী এবং কাকে আমরা বাঙালি বলব?

বাঙালিয়ানার এই বিতর্কে প্রবেশ করার আগে বলে রাখি– আমাদের এখানে এইসব দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারক হচ্ছেন একদল মার্ক্সবাদী ও পশ্চিমের উদারনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী ও চিন্তক। এরা দাবি করেন, বাঙালি সংস্কৃতি-জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ। জাতি পরিচয় নির্ণয়ে এরা মুসলমানিত্বের পরিবর্তে বাঙালিত্বকে অগ্রাধিকার দিতে আগ্রহী। এইভাবে তারা জাতি-পরিচয় নির্মাণে ইসলামের অগ্রবর্তী স্থানকে ক্ষুণ্ন করে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ অবদানে গঠিত স্থানিক সংস্কৃতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের কিছু কিছু নিয়ে এবং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় করে এরা একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধর্মের উজ্জীবনও ঘটিয়েছেন। এটাকেই তারা বলছেন বাঙালিত্ব। সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হয়, ভাব বিনিময় হয়। পারস্পরিক সহাবস্থানের ভেতর দিয়ে একটি

আরেকটিকে প্রয়োজনে পুষ্টিও জোগাতে পারে। কিন্তু সমন্বয় বলতে যা বোঝায়– তা কখনও সম্ভব হয় না এবং জগতে তার কোনো নজির নেই। বলা বাহুল্য, আমাদের সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা এই নজিরবিহীন কাজটি সফল করতে নিশিদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বাঙালি সংস্কৃতি-জাতীয়তাবাদের রূপ সম্পর্কে এরা যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি কতটুকু তা আমাদের সবার আগে জানা দরকার। এটাও জানা প্রয়োজন, এই চিন্তা-ভাবনার পেছনে যে রাজনৈতিক শক্তি কাজ করছে তাদের উদ্দেশ্য কেমন?

আগেই বলেছি এই বাঙালি সংস্কৃতি-জাতীয়তাবাদের চিন্তা-ভাবনা প্রচার করেছেন পশ্চিমের সেক্যুলার ও লিবারেল চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত একদল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মী। পশ্চিমের সেক্যুলার শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গত শতকের বিশের দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়। ইসলামকে অতিক্রম করে এ আন্দোলনের প্রবক্তারা পশ্চিমকে আরাধ্য করে তোলেন। অবশ্য এ আন্দোলন বেশিদিন টেকেনি। তবে ষাটের দশকে এসে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে এই ধারার আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলে। আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পাশাপাশি ছায়ানটের মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় এবং আবুল ফজল, আবদুর রাজ্জাক, আহমদ শরীফ, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জেল করীম, আবদুল হক ও পরবর্তীকালে আনিসুজ্জামান, মোস্তফা নূর উল ইসলাম, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, গোলাম মুরশিদ, হাবিবুর রহমান প্রমুখ এ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন।

কমিউনিস্টরা ছিলেন বরাবরই প্রলেতারীয় সংস্কৃতির অনুসারী। সে হিসেবে তারা চল্লিশের দশকে সূচিত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী পাকিস্তান আন্দোলনকে নিপীড়িতের সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করে একে পূর্ণোদ্যমে সমর্থন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই মেরুকরণ, বিভাজন ও নানা রকমের অসংগতি দেখা দেয়। ফলে কমিউনিস্টরা তাদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির ডগমা ছেড়ে শিল্পকলা, নন্দনতত্ত্ব ও সংস্কৃতির উদারনৈতিক বুর্জোয়া আদর্শকে অনেকটাই আত্মস্থ করে নেয়। এইভাবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বাহকরা কালক্রমে বুর্জোয়া আদর্শের তল্পীবাহকে

পরিণত হয় এবং মার্ক্সবাদী ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধারার বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একধরনের অভিন্নতাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এই দুই ধারার বুদ্ধিজীবীরা বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রায় একই রকম চিন্তা-ভাবনা করেন বলেই মনে হয়।

মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আছেন সালাহউদ্দিন আহমদ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ রফিক, আবুল কাশেম ফজলুল হক, যতীন সরকার প্রমুখ। বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনার থেকে তফাত করে এদের চিন্তা-ভাবনার মৌলিকত্ব আবিষ্কার করা এখন বেশ দুষ্করই বটে। মোটের ওপর এরা সেক্যুলার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতির ঘোর প্রতিপক্ষ। এরা বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে এ কথা আদৌ বিশ্বাস করেন না। এরা মনে করেন, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সংস্কৃতি অভিন্ন। এ আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করা হবে– বাঙালি সংস্কৃতির তাত্ত্বিক গঠনের অন্তঃসারশূন্যতা এবং বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতির অভিমুখের ভিন্নতা, যে কারণে সকল বাংলা ভাষাভাষী মিলে আজতক এক জাতি-সংস্কৃতি গঠনের চেষ্টা কখনোই ফলবতী হয়নি। গতানুগতিক ধারায় সংস্কৃতি বলতে আমরা চারুকলা বিশেষত সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলাকে বুঝি এবং সংস্কৃতির এই সব বহিরাঙ্গিক উপাদান দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু সংস্কৃতিকে আরও গভীরতরভাবে বুঝতে হলে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের ধারায় বিশ্লেষণ করা দরকার।

নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা কোনো একটি জনসমাজের সংস্কৃতির স্বরূপ বিবেচনা করতে গিয়ে নানা রকম উপাদানকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন– যা নিয়ে সংস্কৃতি গঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে– ধর্ম, ভাষা, শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, আত্মীয়তা, বিবাহের রীতিনীতি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, চারুকলা, ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা ও বিশ্বাস প্রভৃতি। পণ্ডিতদের ভেতর এসব উপাদানের মধ্যে সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি কোনটি– এটা নিয়ে আছে মতবিরোধ। কেউ কেউ বলেছেন ভাষা, কেউ কেউ বলেছেন ধর্ম। পৃথিবীর প্রতিটি জনসমাজ বা জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয় এই ধর্ম কিংবা ভাষা দিয়ে। এই ধর্ম বা ভাষা একটি

জনগোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক (Ethnic) পরিচয়ের প্রতীক হিসেবেও চিহ্নিত হয়। তবে এটি সর্বজনীন ঘটনা নয়। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে সমাজবিজ্ঞানীরা অবশ্য নরগোষ্ঠীগত (Race) বৈশিষ্ট্যকেও বিবেচনার কথা বলেছেন। তারপরেও স্বীকার করতে হবে সংস্কৃতি একটি জটিল বিষয়। বিচিত্র সব বিষয়কে একটি সংস্কৃতি আত্তীকরণ করে। সুতরাং একরৈখিক কোনো সংজ্ঞা দিয়ে সংস্কৃতির পরিচয় নির্ধারণ করতে গেলে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখন এসব উপাদানের আলোকে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি অভিন্ন কিনা তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

দুই.

আমাদের সেক্যুলারবাদীদের মতে, বাঙালি সংস্কৃতি-জাতিত্বের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে বাংলা ভাষা। তাদের দাবি– ভাষার সম্পর্ক একদিক থেকে ধর্মের সম্পর্কের চেয়েও নিবিড়। এই কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ধর্মের মিল থাকলেও তা ভাষার ভিন্নতার কারণে আলাদা হয়ে যায়।

অবশ্য আমাদের সেক্যুলারবাদীরা কখনও বলতে পারেননি– ভাষানুগত্য যদি এখানে বড়ো ব্যাপার হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা কেন পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের সাথে মিলে এক অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতি-জাতিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারলেন না? বাঙালিত্বের পূর্ণাঙ্গতার জন্য তো দুই বঙ্গের একত্রীকরণ জরুরি। কিন্তু ইতিহাস সেভাবে এগোয়নি। এখানে বাঙালিত্ব অপেক্ষা বাঙালি হিন্দুর ধর্ম রক্ষার ব্যাপারটাই বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ধর্মের কারণেই বাঙালি হিন্দুরা প্রতিবেশী বাংলাভাষী মুসলমানের চেয়ে অবাঙালি হিন্দুর সাথে মিলে ভারতীয় জাতি গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। এ তো গেল রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার। আমাদের বাস্তবজীবনে বাঙালিত্বকে বেশি জোর দেওয়া হয় না মুসলমানিত্ব-হিন্দুত্বকে বড়ো করে দেখা হয়– তাও এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে একটা মেয়ের কথা উল্লেখ আছে, যার বাড়ি ছিল বর্ধমানে। কিন্তু তাকে বর্ণের কারণে বিয়ে দেওয়া হয় বিহারে। কারণ, দেশে স্ববর্ণ পাওয়া যায়নি। একইভাবে অভিভাবকরা বাঙালিত্বের নামে

কোনো মুসলমান জমিদার নন্দনের সাথে বিয়ে না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলাদেবীকে বিয়ে দেয় সুদূর পাঞ্জাবের এক জমিদার নন্দনের সাথে। কারণ, স্ববর্ণ পেতে অসুবিধা হয়েছিল। কবির জীবনীকাররা লিখেছেন, তার নিজের বিয়ের সময়ও স্ববর্ণ পেতে অসুবিধা হয়েছিল। সুতরাং এটা পরিষ্কার– বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের ভেতরকার আত্মীয়তার সম্পর্ক বাঙালিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়; উলটো আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মের নীতি-নিয়ম দিয়ে। একজন মুসলমান পুরুষ ও নারীর দুনিয়ার যেকোনো ভাষাভাষী মুসলমান পুরুষ ও নারীর সাথে বিয়ে-শাদি ও সামাজিক মেলামেশায় কোনো বাধা নেই। এমনকি আহলুল কিতাবদের সাথেও শর্তাধীনে মুসলমানের বিয়ের সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু আহলুল কিতাব নয় বলে একমাত্র ধর্মান্তর ছাড়া হিন্দুর সাথে সে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক দিয়ে যেমন বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না, তেমনি বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের বিয়ে-শাদির আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও আছে ভিন্নতা– যা দিয়ে বাঙালিত্ব প্রমাণ করা মুশকিল। মুসলমানি বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান যেমন পয়গাম, কবুলিয়াত, আকদ, ওয়ালিমা, কাবিন, তালাকের মতো ব্যাপারগুলো বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। অন্যদিকে বাঙালি হিন্দুর বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানও তাদের একান্ত নিজস্ব ধর্মাশ্রিত। হিন্দু ধর্মীয় মন্ত্রোচ্চারণ, সাত পাকের রীতি, অগ্নি সাক্ষী, সম্প্রদান হিন্দু বিয়ের আবশ্যকীয় বিষয়। পণ বা যৌতুকের অভিশাপ এখন অবশ্য প্রতিবেশী সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজেও কিছু কিছু ঢুকে পড়েছে– যার অনুমোদন আদৌ ইসলামে নেই। বিধবা বিবাহের ধারণা হিন্দু সমাজে আদৌ চিন্তা করা যেত না– যা পরবর্তীকালে আইন করে সিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরেও হিন্দু মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে হয় না– এরকম সংস্কার এখনও বাঙালি হিন্দু সমাজে ভালোমতো টিকে আছে। বিয়ে-শাদির আচারের মতো হিন্দু-মুসলমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা-পদ্ধতিটিও আমরা নিরিক্ষা করতে পারি। মুসলমানের মুর্দা গোসল করিয়ে, কাফন দিয়ে, জানাজা পড়িয়ে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কবরে রেখে আসা হয়। অন্যদিকে হিন্দুর লাশ মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে দাহ করা হয়। সুতরাং বাঙালিত্বের প্রশ্নটা সমাজের বাস্তবতা দিয়েও অনুধাবন করা দরকার।

আবার ভাষার ব্যাপারটায় ফিরে যাই। প্রশ্নটা ছিল– ভাষা এক হলেই জাতিত্ব এক হয় কিনা? দুয়েকটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে। বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, কানাডায় অন্যান্য ভাষাভাষীদের সাথে ফরাসিভাষীরাও বাস করে। এজন্য এসব দেশে একের অধিক ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন নানা রকম টানাপোড়েন সত্ত্বেও এসব দেশের ফরাসিভাষীরা কিন্তু নিজেদের জাতিত্ব ফ্রেন্স হিসেবে দাবি করেনি। তারা বেলজিয়ান, সুইস ও কানাডিয়ান হিসেবেই বসবাস করছে এবং স্ব-স্ব জাতিত্বের সীমানা কেটে বাইরে চলে আসেনি। ঠিক একই কথা খাটে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে। জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা একই জার্মান ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাদের জাতিত্ব যথাক্রমে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান। আবার ইংলিশ, স্কটস ও আইরিশরা ইংরেজি ভাষায় কথা বললেও নিজেদের একজাতি মনে করে না। আমেরিকানরাও ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তাদের জাতিত্ব ইংলিশ নয়। এই ইংরেজি ভাষার রূপ-কাঠামো, উচ্চারণ, বানানও আবার স্থানভেদে পৃথক। আমেরিকানদের উচ্চারণ, বানান, সাহিত্য ও লোক-ঐতিহ্য ইংলিশ, অস্ট্রেলিয়ান বা আইরিশদের থেকে ভিন্ন। আমেরিকানরা হুইটম্যান নিয়ে যে গৌরববোধ করে, ইংলিশরা শেক্সপিয়ারকে নিয়ে তা-ই করে। আবার আইরিশদের কাছে ইয়েটসের যেরকম মর্যাদা, ইংলিশ এলিয়টের মর্যাদা সেরকম নয়। তাই ভাষা এক হলেই জাতি বা জনগোষ্ঠী এক হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতই তার বড়ো প্রমাণ হতে পারে। বহু ভাষাভাষী দেশ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্বের ভিত্তিতে এক ভারতীয় জাতিত্ব তারা গড়ে তুলেছে। ভাষার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি।

ভাষার তাই কোনো সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নেই। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান একই বাংলা ভাষায় কথা বলে ঠিক, কিন্তু একই রকম বাংলা ভাষায় কথা বলে না। লক্ষ করুণ– এখনও মুসলমানরা গোসল করে, স্নান করে না; পানি বলে, জল বলে না অথবা আল্লাহ বলে, ভগবান বলে না কিংবা বাড়িতে ভাবি ডাকে, বৌদি ডাকে না। এই ভাষিক পার্থক্যটা হুমায়ুন কবীর– যিনি আজীবন হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল ছিলেন, তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

> বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও আরবি ফারসি শব্দের ভাগাভাগ নিয়ে মতের অমিল রয়েছে, তারই ফলে একই ভাষার দুটি রূপ ফুটে উঠবার

সম্ভাবনাও রয়েছে। ঢাকা-ফরিদপুরের মুসলমান চাষার কাছে 'কাদম্বরীর' ভাষা একেবারে বিদেশি– এমনকি, আধুনিক বাংলার অনেক মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ বোঝাও তার পক্ষে কঠিন। অন্যপক্ষে পুঁথি পড়ে স্কুল-কলেজে পড়া সাধারণ হিন্দুও তো আনন্দ পাবে না। অনেক জায়গায় অর্থও ঠিক ধরতে পারবে না। উর্দু ও হিন্দির ব্যাপারে ঠিক এই সমস্তই গোড়া থেকে ছিল। লিখবার আলাদা প্রণালী গ্রহণ করায় আজ তারা প্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার বেলা যে তা হয়নি, তার একটি কারণ এই যে, একই হরফে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি বাংলা দুইই লেখা হয়। অন্য কারণ এই যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে ভাষা নিয়ে জাতবিচার খুব বেশি প্রবল হয়ে ওঠেনি। তবু ভাষার তফাত যে খানিকটা এখানে রয়েছে, তা অস্বীকার করা চলে না।"[১]

একই বাংলা ভাষায় তাই দুটো রূপ আছে। একটি হিন্দুয়ানি, অপরটি মুসলমানি। ইংরেজরা এটা বুঝেছিল বলেই তারা বাইবেলের তরজমা করে ব্রাকেটে লিখে দিত 'মুসলমানী বাংলায় অনূদিত'। রেভারেন্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক তার মুসলমানি বাংলার অভিধানে প্রায় ছয় হাজার মুসলমানি শব্দের উল্লেখ করেছেন। তাই ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতি বাংলার প্রচলন সত্ত্বেও এবং হরফ অপরিবর্তিত থাকার পরও বাংলা ভাষার হিন্দু ও মুসলমানি রূপ দু-ধারায় বয়ে গেছে। এর বহু রকমের সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। এর একটা হচ্ছে ধর্ম অনেক সময়ই ভাষাকে প্রভাবিত করে। এর প্রমাণ হচ্ছে উর্দু ও হিন্দি ভাষা। একটি ভাষা বা একটি শব্দ, শব্দবন্ধ ও ইডিয়ম কখনও কখনও একটি সংস্কৃতি বা জাতির প্রতীক হয়ে যায়। ভারতীয় ইতিহাসের উর্দু-হিন্দির বিবাদ তারই প্রমাণ– যার মূলে আছে ধর্মের প্রভাব। এরকম ঘটনা বাংলা ভাষাতেও ঘটেছে। ইসলাম ধর্মের প্রভাব বাংলা ভাষাও অতিক্রম করতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যেও মুসলিম জীবনের প্রভাব পড়েছে। এ প্রভাব না থাকলে বাংলা সাহিত্য মুসলিম জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত না। তাই পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্য একই বাংলা ভাষায় রচিত হলেও তার ইডিয়ম আলাদা,

১. হুমায়ুন কবীর, '*বাংলা ভাষা ও মুসলিম সাহিত্য*', বাংলাদেশ : বাঙালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (সম্পাদক : মুস্তফা নূর উল ইসলাম)। ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স ১৯৯০।

সাহিত্যের উপাদান, ঐতিহ্য, উপকথা, কিংবদন্তি আলাদা। এই আলাদা চরিত্রকে মুছে দেওয়ার জন্য আমাদের এখানকার সেক্যুলারবাদী শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মীরা সচেতনভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন– যাতে আমাদের মুসলিম চরিত্র ও আইডেন্টিটি ক্ষুণ্ন হয়। এটা একান্তভাবেই সম্ভব নয়, এ কারণে– ঐতিহ্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় পরিবর্তিত হয় না। এটি একটি সমাজের সম্পদ– যা হাজার বছর ধরে সমাজের ভেতর টিকে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে– ঐতিহ্য হচ্ছে একটি বিশেষ জনসমাজজাত ঘটনা; ভূখণ্ডজাত ঘটনা নয়।

এই হিসেবে বাংলাভাষী হিন্দু বা বাংলাভাষী মুসলমানের ঐতিহ্য থাকতে পারে, কিন্তু আলাদাভাবে বাংলার কোনো ঐতিহ্য থাকতে পারে না। রাম-লক্ষণ, ভীম-অর্জুন, সীতা-সাবিত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, মথুরা-অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, ইন্দ্র-প্রস্থ বাঙালি হিন্দুর মনে যে স্মৃতি, কল্পনা, রস সৃষ্টি করে, তা বাঙালি মুসলমানের করে না। তাদের মনে আলী-হামজা, হাসান-হোসেন, হাজেরা-রহিমা-ফাতেমা, মক্কা-মদিনা-মিনা-আরাফাত-কারবালা সেই স্মৃতি, কল্পনা, রস উজিয়ে তোলে। এটা শুধু হিন্দু বা মুসলমানের কথা নয়; তামাম দুনিয়ার তামাম জাতি সম্বন্ধেই কথাটা খাটে। সব জাতির চেতনাই বিকশিত হয় তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। সেই ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করেই সাহিত্য রচিত হয়। নাহলে সে সাহিত্য থেকে জাতি প্রেরণা পায় না। এই পার্থক্যের কথাটা পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাতা ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল মনসুর আহমদ নিপুণতার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন :

> বাংলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনেসাঁ আনতে হলে, তার সাহিত্য সাধনাকে অনুকরণ-অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব সাহিত্য দিতে হবে। হিন্দুর সৃষ্ট বাংলা সাহিত্য খুবই বড়ো, খুবই জীবন্ত, খুবই উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তার নকল করে মুসলমান অমন বড়ো, অমন জীবন্ত সাহিত্য রচনা করতে পারবে না। হোমার, মিল্টন, শেক্সপিয়রকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো সাহিত্য রচনা করতে পারতেন না। তিনি তার সাহিত্য সাধনাকে নিজস্ব কৃষ্টির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছেন

> বলেই তিনি আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বাংলার মুসলমানও তেমনি রবীন্দ্রনাথের নকল করে বড়ো হতে পারবে না। তাকে বড়ো হতে হবে তার স্বকীয়ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে, নিজের কৃষ্টিকে বুনিয়াদ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয় পূজায় আনন্দময়ী মা এসেছে-গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মহররমের চাঁদ ওঠেনি। সে চাঁদ ওঠবার ভার ছিল নজরুল ইসলামের ওপর। এতে দুঃখ করার কিছু নাই। কারণ, এটা স্বাভাবিক, কাজেই কঠোর সত্য।[২]

এতক্ষণ ভাষার যে রূপ, বৈচিত্র্য ও মূল্যবোধের কথা আলোচনা করা হলো তা দিয়ে কিন্তু বাঙালিত্ব বা বাঙালি সংস্কৃতি-জাতিত্বের ঐক্য প্রমাণ হয় না; বরং ঐতিহাসিকভাবেই হিন্দু ও মুসলমান যে সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক, তার প্রমাণ কালান্তরে বাংলা ভাষাই হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি চরিত্র অর্জন করেছে। সুতরাং গোঁফ দিয়ে যায় চেনার মতো শুধু ভাষা দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি-জাতিত্বকে নির্ধারণ করতে যাওয়া কত দূর সঠিক তা বিবেচনা সাপেক্ষ।

তিন.

প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বাঙালি জাতি বললে যে জনসমষ্টি বাঙালা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে সেই জনসমষ্টিকে বুঝি।[৩]

অন্যদিকে আমাদের মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর বাঙালিত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এমনিভাবে :

> বাংলাদেশের যেকোনো অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বাস করে বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তারাই বাঙালি।[৪]

---

২. *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য* (সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত সংস্কৃতি*। কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৯

৪. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*। ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৬৭

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংজ্ঞায় ভাষাকেই বাঙালিত্বের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে উমর এই সংজ্ঞাকে একটু টেনে লম্বা করে বলেছেন বাংলা ভূখণ্ডের অধিবাসী ও তার ঐতিহ্যানুসারীদের বাঙালি বলতে হবে। অবশ্য বাংলা ভূখণ্ড বলতে তিনি ব্রিটিশ আমলের Province of Bengal-কে বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়।

সুনীতিকুমার ও উমরের সংজ্ঞার মধ্যে আংশিক সত্য আছে। এটিকে জাতিত্বের পূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে ধরা মুশকিল।

উভয়ের সংজ্ঞা অনুসারে ইউরোপ-আমেরিকায় বর্তমানে যে হাজার হাজার বাংলাভাষী বাস করে এবং এখন সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার চিন্তাও করছে, তারা কি বাঙালি বলে পদবাচ্য হবে? এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরে বাংলাভাষীদের তুলনায় অবাংলাভাষীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। দীর্ঘদিন বসবাসকারী এই বাংলা জানা জন্মসূত্রে অবাংলাভাষীদের কি বাঙালি বলে গণ্য করা যাবে? পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং আমাদের পুরোন ঢাকায় অনেক মুসলমান বসবাস করেন, যারা উর্দু মিশ্রিত বাংলায় কথা বলেন– যাকে সাধারণত খোট্টা ভাষা বলা হয়। তাদেরকে কি বাঙালি বলা যাবে? বাংলা ভাষার ব্যবহারই যদি বাঙালিত্বের পরিচায়ক হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী ঘরানার ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, রেহমান সোবহান প্রমুখের আত্মীয়স্বজন বাঙালি বলে পদবাচ্য হবেন না। আবার বর্তমানে যারা সেক্যুলার ঘরানার বাঙালি সংস্কৃতি-জাতিত্বের তত্ত্বে নির্ভর করেন না; উলটো জাতিত্ব বিচারে ইসলামকে অগ্রাধিকার দেন, তারা কি তবে বাঙালি নন?

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে– রাষ্ট্র ছাড়া জাতি হয় না। সে হিসেবে পশ্চিম বাংলার বাংলাভাষীদের রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত, তাদের জাতীয়তা ভারতীয়। ভাষানির্ভর বাঙালি সংস্কৃতি বা জাতিত্বে তারা আজকাল নির্ভর করেন না বলেই মনে হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে এখন কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায় বাস করে; নৃতাত্ত্বিক কিংবা ভাষিক– কোনোভাবেই এদের বাঙালি বলা চলে না। বাংলাদেশ হওয়ার পর জোর করে এদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের আওতায় আনার কুফল আমরা দেখেছি। ভাষাকে সংস্কৃতি বা জাতিত্বের ভিত্তি করলে এদেরকে আমাদের বর্জন করতে হয়।

রাষ্ট্র ছাড়া জাতি হয় না– এই ধারণা আমরা ইউরোপের সূত্রে পেয়েছি। ইউরোপে রিফরমেশনের পর জাতি-রাষ্ট্র (Sovereign state) প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে কলোনির সূত্রে এশিয়া-আফ্রিকায় তা ছড়িয়ে পড়ে। এই হিসেবে বলা যায়, একটি জনসমাজের সংস্কৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তনীয় অংশ– যা সহজে পালটায় না। কিন্তু জাতিত্ব বারবার পালটাতে পারে। ইউরোপের ইতিহাসে এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে এবং সাম্প্রতিককালে এশিয়া, আফ্রিকায় এর যথেষ্ট নজির রয়েছে। মধ্যযুগে ধর্মই ছিল জাতিত্বের মাপকাঠি। ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা সর্বত্রই ধর্মকে জাতিত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এখনও অনেক দেশে ধর্ম জাতিত্বের শক্তিশালী উপাদান।

আমাদের বাংলা ভাষার বয়স প্রায় এক হাজার বছর, কিন্তু বাংলা ভাষা দিয়ে জাতিত্বের পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা খুবই সাম্প্রতিককালের ঘটনা এবং বলা চলে ষাটের দশকের আওয়ামী লীগের আন্দোলনই তার একমাত্র প্রমাণ। ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম আমলে আমাদের ভূখণ্ডে ধর্মই ছিল জাতিত্বের পরিচয়ের চিহ্ন। যে ভূখণ্ডকে আমরা বাংলা হিসেবে জানি, তার ইতিহাস মাত্র ৬০০ বছর। মুসলমানরা এ দেশে আসার আগে বাংলা নামে কোনো ভূখণ্ড ছিল না। বিভিন্ন নামে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন এই ভূখণ্ডটিকে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ করে এটিকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করে।

সে হিসেবে বাংলা ও বাঙালি শব্দটা ভৌগোলিক তাৎপর্যই বেশি বহন করত। ক্রমে বাংলা ভাষার বিকাশের সাথে সাথে এ শব্দগুলোর একটা ভাষিক ব্যঞ্জনাও শোনা যেতে থাকে, কিন্তু তা কোনোক্রমেই জাতি অর্থে নয়। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি কেউ-ই ভারতকে বাদ দিয়ে জাতিত্ব নির্মাণের কথা ভাবেননি। ভারতীয়তার মধ্যেই সেদিন বাঙালিত্ব আত্মলোপ করে। ভারতীয়তা বলে কংগ্রেস যে জাতীয়তার কথা প্রচার করত তার আসলে কোনো শক্ত বুনিয়াদ ছিল না। মূলে ভারতে বরাবর দুটো জাতীয়তাবাদ ক্রিয়াশীল ছিল। একটি মুসলিম, অন্যটি হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বলা অনাবশ্যক– এ জাতীয়তার ভিত্তি ছিল ধর্ম। এ কারণেই সে সময় 'মোসলেম ভারত', 'হিন্দু ভারত' কথাগুলো আমরা শুনেছি। এসব শব্দের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে বোঝার মতো। ধর্মই ভারতের ইতিহাসকে

যুগ যুগ ধরে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ধর্মীয় বিভাজনের কারণেই একসময় ভারত ভাগ হয়ে যায়। একই কারণে বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হয়। সেই সাথে আমাদের জাতিত্বও চিহ্নিত হয় অন্যভাবে। মুসলমান প্রধান পূর্ব বাংলার বাংলাভাষীরা পরিণত হয় পাকিস্তানিতে, হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলার বাংলাভাষীরা পরিণত হয় ভারতীয়তে। পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথমে মাত্র তিন বছরের জন্য বাঙালি, পরে আবার বাংলাদেশিতে পরিণত হয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসেবে সেক্যুলারবাদীরা বাংলাকে উল্লেখ করেন। বাংলাকে ভিত্তি করে ষাটের দশকের স্বল্প কয়েক বছরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই হচ্ছে আমাদের সেক্যুলারবাদীদের ভাষিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র নজির– যা নাকি এ ভূখণ্ডের এক হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে বুদবুদের মতো ঘটনা। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ দেশের মানুষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি এবং পুনরায় ইসলাম প্রভাবিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে স্বাগত জানিয়েছে। এটি আবার একই সঙ্গে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের শর্তও পূরণ করেছে। পাকিস্তান ভেঙে গেছে মূলত ঐ রাষ্ট্রের মধ্যকার ভৌগোলিক তফাতের কারণে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে, যার জন্য তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বের অকার্যকারিতাই দায়ী। ষাটের দশকের আওয়ামী লীগের আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের রাজনীতির অব্যবস্থাপনার ফসল– যাকে কিনা পরবর্তীকালে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হিসেবে তত্ত্বীয় আকার দেওয়া হয় ওই রাজনীতির বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বৈধতা প্রতিপন্ন হতো, যদি একই ধরনের আন্দোলন পশ্চিম বাংলায়ও গড়ে উঠত। সে হিসেবে বলা যায়– ধর্মই এ অঞ্চলে জাতিত্ব নির্মাণের প্রধান উপাদান হিসেবে দীর্ঘ হাজার বছর ব্যাপী টিকে আছে।

চার.

তাহলে এটা পরিষ্কার, গত হাজার বছরেও ভাষা দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মোদ্ধ তৃতীয় কোনো বাঙালি সত্তা বা বাঙালিত্ব এখানে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। সেক্ষেত্রে ওই তৃতীয় বাঙালি সত্তাটির ধারণা কীসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে? অনেক গুণীজন মনে করেন– যেহেতু আমাদের একই পূর্বপুরুষ, তাই আমাদের একটা অভিন্ন বাঙালি সত্তা আছে। সেই হিসেবে সুনীতি কুমার একবার বলেছিলেন, মুসলমান তার রক্তের সম্পর্কের ভাই।

এই বিবৃতির মধ্যে নাটকীয়তা আছে, কিন্তু বাস্তব মূল্য আদৌ নেই। রক্তের সম্পর্কের দাবি নিয়ে যদি কথা বলতে হয়, তাহলে তো বলতে হয়, সমগ্র বিশ্বমানব সমাজের একই উৎস বা একই পিতা থেকে উত্থান ঘটেছে। সেই হিসেবে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ বা জনসমাজের সদস্য পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় কিংবা জ্ঞাতি গোত্র এবং একই দাবিতে তাদের সাথে সমজাতীয়ত্ব কল্পনা করাও অযৌক্তিক নয়।

'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' কথাটা চিন্তার জগতে বা ভাবজগতে যতখানি আলোড়ন তোলে, আমাদের বাস্তব পৃথিবীর রূঢ় চিত্র কিন্তু পুরোটাই তার অঙ্গীকার বহন করে না। সমজাতীয়ত্ব কিংবা ভ্রাতৃত্বের দাবি নিয়ে কেউ যদি আমাদের এখান থেকে ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে চায়, তবেই বোঝা যাবে– কত ধানে কত চাল। রক্তের সম্পর্ক কিংবা আদি পুরুষের কথা বাদ দিয়ে এখন যদি নৃগোষ্ঠী বা জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের কথা ধরি, তাহলেও দেখা যায়– ধর্মের বাইরে তৃতীয় কোনো বাঙালি সত্তা সেখানে অনুপস্থিত। উলটো এই ধর্মই বাংলাভাষী জনসমাজের জাতিতাত্ত্বিক ও নরগোষ্ঠীগত (Ethnicity and Race) পরিচয়কে রাজনীতির মতোই বিভাজিত করে ফেলেছে। ভাষা এক হলেই যেমন একজাতি হয় না, তেমনি জাতিতাত্ত্বিক ও নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য এক হলেও জাতিত্ব এক নাও হতে পারে। ইংরেজ ও জার্মানরা এক নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কয়েকশ বছর ধরে তারা যেভাবে লাঠালাঠি করেছে, তাতে আর কেউ তাদের এক জাতীয়তার কথা শুনতে পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অঞ্চলের জনসমাজ হচ্ছে সেমিটিক নরগোষ্ঠীভুক্ত। এর মধ্যে মুসলমান আছে, ইহুদি আছে, খ্রিষ্টান আছে। কিন্তু তাই বলে এখন যদি কেউ সেখানকার ইহুদি ও মুসলমানদের এক জাতি বলে দাবি করে থাকে, তবে তার মতো কৌতুক বোধ হয় একালে আর একটিও হবে না। ইরানিরা নরগোষ্ঠীগত দিক দিয়ে আর্য; ভারতের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের দাবি তারাও আর্য, কিন্তু এদের দুয়ে মিলে কেউ একজাতিত্বের কথা ভাবেনি। ভারতবর্ষে আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রো-মঙ্গোলয়েড ও আলপিনীয় গোত্রভুক্ত মানবধারার ছড়াছড়ি। কিন্তু তাই বলে এরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জাতিত্বের দাবি নিয়ে খাড়া হয়ে যায়নি। এর থেকে বোঝা যায়– কেন বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমানের পূর্বপুরুষ নরগোষ্ঠীগতভাবে (আর্য-দ্রাবিড়-আলপিনীয় গোষ্ঠীর শংকর) এক হলেও শুরু থেকেই হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী বা জনসমাজ পৃথক হিসেবে গড়ে উঠেছে।

রক্ত বা কুলের (Race) সম্পর্ক দিয়েই কিন্তু সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বর্তায় না– এ কথা সমাজবিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, কীভাবে বিভিন্ন গোত্রের (Race) মধ্যে একই রকমের সংস্কৃতি দেখা যায়, আবার একই গোত্রের মধ্যে কোনো রক্তের পরিবর্তন ছাড়াই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটতে পারে। রক্ত সম্পর্ক দিয়ে জাতিত্ব নির্ণয়ের অসুবিধার জন্য অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা আজকাল একটি জনমণ্ডলী বা জনসমষ্টিকে তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ধর্ম দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এসব সমাজবিজ্ঞানীরা এখন একমত হয়েছেন, এক ধর্মাবলম্বীরা একটি জনগোষ্ঠী (Eihnic group) হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে আমরা একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর মতামতের উদ্ধৃতি নিতে পারি :

> In the specific realities of social intercourse, however religious groups very often act as and are felt as ethnic groups. The overwhelming majority of people, after all are born in to a religion, rather than adapt it just as they are born into an ethnic group, in this respect both are similar. They are both groups in which one's status is immediately given by birth rather than given by some activities in one's life.

তিনি আরও লিখেছেন :

> Aside from the normal close connection between religion and ethnic group, religion in itself is culture forming and thus fashions ethnic groups.[৫]

সামাজিক মেল-বন্ধনের বিশেষ বাস্তবতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো শুধুমাত্র ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মতো আচরণই করে না; তারা নিজেদের ভিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে অনুভবও করে। এর একটি কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই একটি ধর্মগোষ্ঠীর ভেতর জন্মগ্রহণ করে। তুলনায় ধর্মান্তর গ্রহণকারীর সংখ্যা কম, যেভাবে জন্মগ্রহণের কারণে মানুষ একটি Ethnic group-এর সদস্য হয় ঠিক সেই ভাবেই। এই ক্ষেত্রে ধর্মগোষ্ঠী আর জনগোষ্ঠী হচ্ছে সমপর্যায়ের। এগুলো সেরকম গোষ্ঠী– যেখানে

---

৫. Nathan Glazer, *Ethnicity : A world phenomenon*; Published in Journal Dialogue in 1977,

জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কার্যক্রমের ভিত্তিতে এই অন্তর্ভুক্তি ঘটে না। ধর্ম ও Ethnic গোষ্ঠীর স্বাভাবিক খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়াও এটা সত্য যে, ধর্ম নিজেই সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং সে কারণে ধর্ম একটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী তৈরিতে সহায়তা করে।

ধর্মের এই যে একটি Culture forming ভূমিকা আছে, এর কারণে ধর্ম সংস্কৃতির প্রায় প্রত্যেকটি সূচককে স্পর্শ করে। যার ফলে ধর্ম মানুষের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, আত্মীয় সম্পর্ক, রন্ধনশৈলী, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় সবকিছুর মূল্য-চেতনায় একটা পরিবর্তন আনে। অনেক সেক্যুলারবাদী বুদ্ধিজীবীরা যেরকম দাবি করেন, প্রকৃত অর্থে ভাষার ধর্মের মতো ঠিক সেরকম সর্ববিস্তারী Culture forming ক্ষমতা নেই।

এরপরেও যারা বলেন– হিন্দু ও মুসলমান শত শত বছর ধরে পাশাপাশি বাস করেছে, একই ক্ষেতের ফল, একই নদীর পানি, একই সূর্যের আলো ভোগ করে আসছে, একই গ্রামে বাস করে প্রতিবেশী সমাজের তৈরি জিনিস ব্যবহার করেছে ও খেয়েছে, একই সঙ্গে হাটে-বাজারে উঠা-বসা করেছে, যাত্রাপালা উপভোগ করেছে, তাদের শুধু ধর্ম সংস্কারের কারণে তফাত করে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত! এ বিবৃতির মধ্যে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা আছে, কিন্তু এর বাস্তব মূল্য খুব সামান্য। আবার সেক্যুলারবাদীরা যেভাবে বলেন, শুধু ধর্মীয় সংস্কারের ভিন্নতার জন্য হিন্দু-মুসলিম ভিন্নতার চেষ্টা করা অনর্থক। ধর্মকে সংস্কার বলে খাটো করার চেষ্টা সেক্যুলারবাদীদের মজ্জাগত অভ্যাস। ধর্ম নিছক সংস্কার নয়। কোটি কোটি মানুষের আচরণীয় রীতি সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সংস্কার হয় না; হয় সংস্কৃতি এবং আগেই বলেছি ধর্মের একটা Culture forming ভূমিকা আছে। সেক্যুলারবাদীদের কথা সত্য হলে একই সূর্যের আলো ভোগ করি বিধায় আমেরিকানদের সাথে আমরাও সমজাতীয়ত্ব দাবি করতে পারি কিংবা আমরা এখন অনেকে চীনা খাবার খাই বলে চীনা ও আমরা একই জাতি। সংস্কৃতিতে সাধারণটা ধর্তব্য নয়; পার্থক্যটাই প্রধান। এই পার্থক্যটাই স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। দুনিয়ার সব মা-ই সন্তানকে দুধ খাওয়ায় এটা সংস্কৃতি নয়; কীভাবে খাওয়ায় সেটাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে আত্মপরিচয়; কোনো সাধারণ পরিচয় নয়।

সত্য বটে– বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিতে অনেক মিল আছে; কিন্তু এটাও ঠিক, তাদের মধ্যে গরিমলও আছে। গরমিলটাই সত্তা। ওই সত্তা দিয়েই একজনকে আরেকজন থেকে তফাত করা যায়। গরমিলটা বাদ দিলে সত্তা থাকে না, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যেরও প্রয়োজন হয় না। আমাদের সেক্যুলারবাদীরা আমাদের এক স্বাতন্ত্র্যহীনতার দিকে টানতে চান। এটা যেমন অসম্ভব, তেমনি অবাস্তব।

ধর্ম হিসেবে ইসলাম খুব পরিষ্কার, সুস্পষ্ট– এর নড়চড় হওয়া শক্ত ব্যাপার। এরকম তৌহিদবাদী (Monothiestic) ধর্ম পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রকৃতিগতভাবে হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিক চরিত্রের। এর রীতিনীতি অনেকটা flexible এবং বর্ণাশ্রম এর বৈশিষ্ট্য। ধর্মের এই চরিত্রের কারণে হিন্দু ও মুসলমানের জীবনদর্শন ও জীবনবোধের মধ্যেও তৈরি হয় তফাত। এই জীবনদৃষ্টির পার্থক্যই সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নতা আনে। এই কারণেই বাঙালি মুসলমান হিন্দুর মতো ভাত, মাছ, ডাল, শাক, বেগুনবর্তা, লাউ, শুটকি, চচ্চড়ি খায় বটে, কিন্তু সে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করে; হিন্দু সেটা করে না। হিন্দু গোশত খায়, মুসলমানও গোশত খায়, কিন্তু মুসলমান হালাল গোশত খায়, হিন্দুর তা প্রয়োজনে পড়ে না। ধর্মীয় কারণেই হিন্দু গরু খায় না, মুসলমান খায়। মুসলমান গরু জবাই করে, হিন্দু পাঠা বলি দেয়। বাঙালি হিন্দু মশলা দেওয়া খাবার কম খায়। মুসলমান বেশি খায়। এরকম নজির ভুরি ভুরি।

মুসলমানরা যখন এ দেশে আসে, তখন কিন্তু তাদের শিল্পীরা ভাস্কর্যে মন দেয় না; মন দেয় স্থাপত্য শিল্পে। কারণ, মুসলমান শিল্পীরা ধর্মীয় কঠোরতার কারণে মানুষের মূর্তি তৈরি করেনি। মুসলমানরা যে দেশেই গেছে, সেখানেই এক নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছে। বড়ো বড়ো সৌধ, ইমারত সেই সভ্যতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুসলমান শিল্পীরা গ্রিক ভাস্কর্য কিংবা হিন্দু ভাস্কর্যের মতো কিছু গড়ে তোলেনি। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই রকম ঘটনা। মুসলমান শিল্পীরা লতা, ফুল, ফলের মতো অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়ে যেমন আগ্রহ দেখিয়েছে, তেমনি মানুষের ছবি আঁকায় তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

একই কারণে দেখা গেছে– বাঙালি হিন্দুদের সাহিত্যে হিন্দু মহাকাব্য, পুরাণ ও হিন্দু চরিত্রের স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য বেশি। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যে হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণের প্রতিফলন নেই।

একমাত্র ব্যতিক্রম নজরুল। একই ভাষায় লেখালিখির জন্য হিন্দুর রচিত সাহিত্য মুসলমানের মতোই বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের অংশ, কিন্তু কোনোভাবেই মুসলমান সংস্কৃতির অংশ নয়। এখন বাংলা সাহিত্যের হিন্দু উত্তরাধিকারকে মুসলমান কীভাবে বা কতটুকু গ্রহণ করবে? নিজ সংস্কৃতির মূল্যবোধের প্রতিপক্ষ না হলে বিশ্বের তাবৎ সাহিত্যের মতোই এ সাহিত্যের রস উপভোগ করতে কোনো বাধা নেই। সংস্কৃতির পরিধি অনেক ব্যাপক, তার নিজস্ব অনেক বাছবিচার, মাপকাঠি থাকে। এই মাপকাঠিতেই সংস্কৃতির প্রত্যেকটি উপাদানের চুলচেরা বিশ্লেষণের দরকার হয়। সেই মাপকাঠির কথা ভেবেই নজরুল লিখেছিলেন : বিশ্ব কলা লক্ষীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। ঐ ঢংটাই স্বাতন্ত্র্য। বাংলা সাহিত্যের যে মুসলমানী ঢং, তা ঐ স্বাতন্ত্রের প্রকাশ মাত্র। যে কারণে সুকুমার সেনের মতো পণ্ডিতকেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে *'ইসলামী বাংলা সাহিত্য'* বলে আরেকটি পৃথক বই লিখতে হয়েছিল।

এই মাপকাঠি অনুযায়ী আমাদের ভূখণ্ডের প্রাক-মুসলিম ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত সৃষ্টিগুলো সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। কুমিল্লার ময়নামতি ও বগুড়ার পাহাড়পুরের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প সৃষ্টিকে এই ভূখণ্ডের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়; মুসলিম সংস্কৃতির অংশ বলা যায় না। সংস্কৃতিতে, সংস্কৃতিতে সহাবস্থান হয়। ইসলাম যে দেশে গিয়েছে, সেখানে এই নীতিকে অনুসরণ করেছে। প্রাক-মুসলিম ঐতিহ্যকে যথাস্থানে রেখে নিজের সংস্কৃতির বর্ধন করেছে। এর অর্থ এই নয়, ইসলাম প্রাক-মুসলিম সংস্কৃতির সাথে আপস করেছে কিংবা সমন্বয় করে চলার চেষ্টা করেছে। ইসলাম মিশরের পিরামিড ধ্বংস করেনি, কিন্তু সেখানে মুসলিম সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। ইসলাম ভারত এসেছে। এখানে নতুন মুসলিম সংস্কৃতি জেগে উঠেছে। কিন্তু মুসলমানরা এখানকার দেবমন্দির ও দেবমূর্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেনি। দু'চারটি মন্দিরে ধ্বংসের কথা যেটা বলা হয় কিংবা সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দিরের লুটপাটের ব্যাপারটা– তার পুরোটাই রাজনৈতিক; এর সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই।

এভাবে ধর্মের সঙ্গে উৎসবের যোগও গভীর। উৎসব হচ্ছে মানুষের সামাজিকতার শিল্পিত প্রকাশ। সেই শিল্পিত প্রকাশকে এক একটি ধর্ম গভীর মহিমা দিয়েছে। উৎসবের এই আশ্চর্য রূপটা তৈরি হয়েছে ধর্মীয় মূল্যবোধের ছাঁচে। বাঙালি হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্বণ আর

মুসলমানের ঈদ উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা। এই ভিন্নতাকে, সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার জন্য আমাদের সেক্যুলারবাদীরা গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ঢাকার নাগরিক জীবনে পহেলা বৈশাখের উৎসবকে চালু করেছেন। এদের দাবি– এটি নাকি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেক্যুলার উৎসব। উৎসবের সেক্যুলারইজেশন কথাটা অনেকটা কাঠালের আমসত্ত্বের মতো শোনায়। তাত্ত্বিকভাবে সেক্যুলারাইজেশন রাষ্ট্রের হতে পারে, কিন্তু সমাজের হতে পারে না। ধর্ম ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ছাড়া কোনো সমাজ কল্পনা করা যায় না। সে হিসেবে উৎসবেরও সেক্যুলারাইজেশন হয় না। পশ্চিমের নিউ ইয়ার ও ইরানের নওরোজ উৎসব যথাক্রমে খ্রিষ্টীয় ও প্রাচীন জরথুস্ত্রীয় মূল্যবোধের মিল-মিশাল দেওয়া এক উৎসব। নওরোজের কথা শুনে আমাদের রসুল সা. বলেছিলেন– প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে। মুসলমান জাতির উৎসব হলো ঈদ।

মুসলমান বাদশাহরা আমাদের এখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথা চিন্তা করে হিজরি সনের সাথে মিলিয়ে বাংলা সনের সূচনা করেছিলেন। সে হিসেবে বাংলা সন হচ্ছে একান্তভাবে এখানকার মুসলমান সভ্যতার সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের সেক্যুলারবাদীরা তাদের মজ্জাগত ইসলাম-বিদ্বেষের কারণে ঢাকার এই বৈশাখী উৎসবে প্রাক-মুসলিম সাংস্কৃতিক উপাদানকে অনুপ্রবেশ করার কসরত করে যাচ্ছেন। মন্দিরের পেন্টিং, আলপনা, উলকি, উলুধ্বনি ভূত-প্রেতের মুখোশ হলো একটি বিশেষ ধর্মের প্রতীক। এই বিশেষ ধর্মের প্রতীক চালু করে বৈশাখী উৎসবের তারা কী ধরনের সেক্যুলারাইজেশন করতে চান, তা বোঝা বেশ দুষ্কর। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হওয়া উচিত মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলোয়।

আমাদের সেক্যুলারবাদীদের আরেকটি মনগড়া তত্ত্ব হচ্ছে– বাঙালি সংস্কৃতি নাকি অবিভাজ্য, বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও সমন্বয়বাদী। এই সমন্বয় পন্থার উদাহরণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও নাথবাদ। বাউলের সহজিয়া ধর্ম ইত্যাদি। এ সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো যত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হোক না কেন, এটি ইসলামের মূল্যবোধের বিপরীত। সে কারণে মুসলমানরা এসব লৌকিক ধর্মের কোনো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে এসব বৈশিষ্ট্যও কখনও মুসলিম গণজীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইসলামের সঙ্গে সেক্যুলারবাদের

কোনো মিল-মিশাল সম্ভব নয়। মুসলমানের কাছে ইসলামের স্থান সবার আগে। সে হিসেবে দেশের মাটি থেকে উৎসারিত ইসলামের মূল্যবোধের বিপরীত পৌত্তলিকতাশ্রয়ী ধর্ম, কাব্য পূরাণ, পুণ্যস্থান, দেবদেবী মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসীদের পক্ষে বৌদ্ধ, হিন্দু সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নয়।

বাঙালিত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতি হচ্ছে একটা মিথ। এর সমন্বয় পন্থার দাবিও একটা অনৈতিহাসিক কথা। অমুসলিম উপাদান দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানকে কীভাবে সমন্বয় করা যাবে, কীভাবে একই মোহনায় তাদের মেলানো যাবে– তা বোধগম্য নয়। সেক্যুলারবাদীরাই এ মিথের প্রচারক, যারা অমুসলিম সাংস্কৃতিক উপাদান দিয়ে এ দেশের বাঙালি মুসলমানকে এক ঝড়ে পড়া পথহারা নৌকার যাত্রী বানাতে চান এবং এমনিভাবে তাদের আইডেন্টিটি বিসর্জন দেওয়ার পথেও ধাবিত করাতে চান। এই আত্মঘাতী প্রক্রিয়া বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান কখনোই গ্রহণ করবে না। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান ইসলামভিত্তিক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা নিয়ে থাকবে, যেই সত্তা বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতিরই একটি প্রকাশ। ইসলাম যে দেশে গিয়েছে, সেখানেই তার সংস্কৃতির বিপুল ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটেছে। ইসলামি সংস্কৃতির বাগানে তাই নানা রঙের, নানা খুশবুর ফুল ফুটে আছে। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি সেই রূপময় বাগানের একটি বাহারি ফুল।

বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়

বাঙালি সংস্কৃতির রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু হয় উনিশ শতকের শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। ব্রিটিশের দানে ও করুণায় সেদিনের কলকাতা যেমন আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে, তেমনি ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষণায় তাদেরই সহযোগী ও অনুগত বাঙালি বাবুরা সেখানে এক বর্ণহিন্দুর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজমের শক্তি ও প্রচারের জোরে সেদিনের এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাসমূহ বাঙালির সংস্কৃতি নামে সিন্দাবাদের ভূতের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে এবং সেই ভূতের বোঝা আজও আমাদের অনেকের ঘাড় থেকেই নামতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক আমলে বর্ণহিন্দুর সংস্কৃতি এই যে এভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করল, তা কিন্তু কলকাতার বাবুদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী এক ছাপ ফেলল এবং এই সংস্কৃতি কখনও অখণ্ড ভারত আবার কখনও দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সাথে একাত্ম হয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সবাই কমবেশি বাঙালিত্ব ও ভারতীয়তাকে হিন্দুত্বের সাথে এইভাবে গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

এ দেশে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে তাদের প্রধান সহযোগী ছিল কলকাতার বর্ণহিন্দুরা, যারা ইংরেজি শিক্ষার মানদণ্ডে ও ঔপনিবেশিক শক্তির কলাবরেটর হিসেবে ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত হলো। এই ভদ্রলোকরা বিশ্বাস করতে শুরু করল, এখন থেকে তারাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতে আধিপত্য কায়েম করবে। এক পা শহরে, আরেক পা গ্রামে রাখা এই শ্রেণি পশ্চিমের 'মডার্ন'-এর কিছুটা অনুগামী হলো ঠিকই, কিন্তু হিন্দু ভাবাদর্শ ও প্রাচীন ভারতের উজ্জীবনের স্বপ্ন তাদেরকে মাতিয়ে রাখল আরও বেশি। এইভাবে উনিশ শতকী ভদ্রলোকের

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাসমূহ নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পথ ঘুরে সাম্প্রদায়িকতায় এসে পৌছায়। এসব কথা আজকাল অনেক রাজনীতি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক স্বীকার করছেন; বিশেষ করে সম্প্রতি প্রকাশিত জয়া চট্টোপাধ্যায়ের *'বেঙ্গল ডিভাইডেড'* নামক ক্যাম্ব্রিজের গবেষণা সন্দর্ভে এর একটা তথ্যভিত্তিক চিত্র পাওয়া যায়। জয়া চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন– বঙ্গভঙ্গের রাজনীতির ভেতর দিয়ে কীভাবে কলকাতার ভদ্রলোক শ্রেণি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। কলকাতার বাবু ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই যে মৌলবাদের বীজ ঢুকে পড়েছিল, তার হাত থেকে বাবুরা কিন্তু আজও রেহাই পাননি; বরং ভারতের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচয়ের আড়ালে সক্রিয় হিন্দুত্ববাদী ধ্যানধারণাকে শুধু দিল্লিকেন্দ্রিক কংগ্রেস বা বিজেপির নেতা ও চিন্তকরা প্রশ্রয় দেননি, কলকাতার প্রগতিশীল বাম রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিকরাও এদিক দিয়ে মোটেই পিছিয়ে থাকেননি। কয়েক দশকের বাম রাজনীতিও বাবুদের হিন্দুত্বের বোধ ও মননে ফাটল ধরাতে পারেনি বলেই মনে হয়। অন্যথা সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে এত তর্জন-গর্জন করার পরও কলকাতার হিন্দুপাড়ায় মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া না দেওয়া এখনও অলিখিত রীতি রয়ে যায় কী করে– যাকে আর যাই হোক উদার অসাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত কোনো মানবিক বিবেচনা বলা যাবে না।

সেই গত শতকের প্রথম দিকে যখন সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমুপস্থিত হয়, তখন প্রায় সমসাময়িক কালেই এর ঢেউ এসে ভারতে আঘাত হানে। কিন্তু ভারতের– বিশেষ করে বাংলার কমিউনিস্ট নেতা, চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীরা সেদিন কতটুকু সেক্যুলার হতে পেরেছিলেন, তাদের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ভেদজ্ঞান কতটুকু স্পষ্ট হতে পেরেছিল, তা নিয়ে কিন্তু বরাবর একটা সংশয়ের কুয়াশা ঝুলেই আছে। কমরেড মোজাফফর আহমদ বা এম. এন. রায়ের মতো দুই-একজন রাজনৈতিক মনিষী ও বুদ্ধিজীবীর ব্যতিক্রমী উপস্থিতি বাদ দিলে গত শতাব্দীর বাম বুদ্ধিজীবিতার প্রবণতা খেয়াল করলে হতাশ হতে হয়। লক্ষ করার ব্যাপার হলো– বাংলায় পুরো শতাব্দীর বাম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব এসেছে অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর দলছুট কর্মীদের ভেতর থেকে। গত শতকের বিশ আর ত্রিশের দশকের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে

এরাই পরবর্তীকালে মুখোশ পরিবর্তন করে কমিউনিস্ট অবতারে পরিণত হয় এবং এমনি করে ঋষি বঙ্কিম ও অরবিন্দের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী ঐতিহ্যকে বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আত্মস্থ করে নেয়। বাইরে নিম্নবর্গের মানুষ আর প্রলেতারিয়েত শ্রেণির জন্য অশ্রু ভেজালেও ভেতরে ভেতরে কলকাতার বাবু সংস্কৃতির পূজা করতে তাদের এতটুকু বাধেনি। গীতা আর মার্ক্স তারা একই সাথে চর্চা করেছেন এবং সংগোপনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তারা এমনভাবে লালন করে এসেছেন যে, কলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবীদের মতোই এই বাম বুদ্ধিজীবীরাও বাঙালি মুসলমানদের এক আধিপত্যবাদী চোখ দিয়ে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। লক্ষ করুন, কলকাতার বাবু সংস্কৃতির মতোই এই বাম বুদ্ধিজীবীতাও অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে আজও বিভোর হয়ে আছে এবং এই অখণ্ড ভারত এক বিপজ্জনক ধারণা– যা শুধু কাল্পনিকই নয়; সাম্প্রদায়িক ও আধিপত্যবাদীও বটে। এ ধারণা বরাবরের মতো আজও উপমহাদেশের স্থিতিশীলতা ও সহাবস্থানের সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ।

কলকাতার বাম রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবীরা দীর্ঘদিন যে অরবিন্দ-বঙ্কিমের আদর্শকে সংগোপনে লালন করে এসেছেন, তার প্রভাব আমাদের এ পূর্ব বাংলায়ও কিছুটা পড়েছে বলে মনে হয়। কলকাতার বাবু কমিউনিস্টরা গোপনে গোপনে বঙ্কিম-অরবিন্দের পথ নিলেও এখানকার বাঙালি মুসলমানের ঘরে জন্ম নেওয়া কমিউনিস্টরা ঠিক তার উলটো পথে হাঁটতে শুরু করেছেন এবং পিতা-প্রপিতামহের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর ঠিকানা ছেড়ে-ছুড়ে কলকাতাকে আদর্শ বিচারের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে ফেলেছেন। কলোনির যুগে বাঙালি হিন্দুর তুলনায় শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি আর সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান পিছিয়ে থাকার কারণে তাদের মধ্যে একটা হীনম্মন্যতা কাজ করেছে এবং সেই হীনম্মন্যতা হেতু বাঙালি মুসলমানের কেউ কেউ বাঙালি বলতেই কলকাতার বর্ণহিন্দুর সংস্কৃতির দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। বাঙালি সংস্কৃতি বলতে এরা কলকাতার বাবুদের সংস্কৃতিকে সজ্ঞানে কিংবা অবচেতনভাবে আত্মস্থ করে ফেলেছেন। এ কারণেই এখানকার কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখি, প্রলেতারিয়েত মার্কসের চর্চার চেয়ে ফিউডাল রবীন্দ্রনাথ চর্চার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বড্ড রকম বেশি। এই অতি আগ্রহই বলে দেয়–

তাদের উদ্দেশ্যের উৎসমুখটা কোথায়? এখানকার বাম তাত্ত্বিক, লেখক ও সংস্কৃতিসেবীরা গত কয়েক দশক ধরে এ দেশের মানুষকে দিয়ে যে পরিমাণ রবীন্দ্রচর্চা করিয়েছেন, তা বোধ হয় পুরো ভারতবর্ষেও এ যাবৎকালের ইতিহাসে সম্ভব হয়নি। এদের কাছে কমিউনিস্ট এজেন্ডার চেয়ে কলকাতার এজেন্ডা যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য।

এটা সত্য, আজ বাঙালি মুসলমানের গণজীবনে বাম রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব নিতান্তই তাৎপর্যহীন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এরা এখানকার ছাত্র ও বিদ্বৎসমাজের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছে; বিশেষ করে এখানকার সংস্কৃতির উৎসমুখগুলো চিহ্নিত করে তাতে ভাঙ্গন ধরানোর সবরকমের কারসাজি তারা করেছে। তারা এক ধরনের অবিশ্বাসের সংস্কৃতি ছড়িয়েছে, বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতির নামে কলকাতামুখীনতার সুড়সুড়ি দিয়েছে এরাই। লক্ষ্যণীয়, এদের এই পাতা ফাঁদে এখানকার কেউ কেউ পা দিয়েও বসেছেন। এদেশে ইসলামবিরোধী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে এরা এবং এটিকে নানা কৌশল ও প্রক্রিয়ায় সমাজের কোনো কোনো পদস্থ ব্যক্তি নিরাপত্তার ছায়া দিয়ে রেখেছেন।

বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা পাড়তে গেলেই এসব অবিশ্বাসী সাহিত্যব্রতীরা প্রচার করে বেড়ান, বাংলার মুসলমানরা কখনও দেশকে ভালোবাসতে পারল না। এদের মন-মানস আজও ইরান-আরবমুখী হয়ে আছে, অতীতচারিতা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যুক্তি প্রয়োগের কৌশলটি লক্ষ করুন। এই মুসলমানই যদি পরমুহূর্তে কলকাতার বাবু সংস্কৃতিকে নির্বিচারে গ্রহণ করতেন, তবে তারা একদিনেই স্বদেশপ্রেমিক হয়ে যেতেন। অথবা এরা ইসলাম ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো মতাদর্শ (পাশ্চাত্য কিংবা সমাজতান্ত্রিক) গ্রহণ করতেন, তবে তারা হয়ে যেতেন প্রগতিশীল। অবশ্য গোলমালটা এখানেই। মুসলমানের কাছে পরম আদর্শ ইসলাম, যেকোনো আদর্শ ও নীতির চেয়ে এটি তার কাছে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইসলামের সারবান আদর্শ তার বিশিষ্ট মূল্যবোধের আওতায় দেশকেও ভালোবাসতে শেখায়। নিজের দেশকে ঘৃণা বা এর জনসাধারণকে তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। এই জন্যই দেখি– ঊপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানরা কলোনির প্রভু ও তার এ দেশীয় বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জিহাদে জড়িয়ে পড়েছেন।

দেশের জন্য, ধর্মের জন্য অকাতরে জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তারাই প্রকৃত অর্থে স্বদেশগতপ্রাণ। আর এ দিকে বাঙালি হিন্দুরা তখন কী করছেন? কলোনির প্রভুদের সহযোগী হিসেবে এসব জানবাজ দেশপ্রেমিক মুসলমানদের কষে গালমন্দ আর নিন্দা করছেন, আর তাদেরই মতো করে ইংরেজি উচ্চারণে এদেরকে অভিযুক্ত করে বলছেন Raiders, Marauders, Fanatic কখনও Terorist.

আগেই বলেছি, সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য কলকাতার বাবু সংস্কৃতির উত্থান ঘটানো হয়েছিল। সংগত কারণে সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধনেই সেদিন মুসলমানদের ইমেজ খাটো করার জন্য এসব ইংরেজের অর্থভোগী সংস্কৃতিসেবীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমহীনতার অভিযোগ আনে। আজ এতদিন পর নিরপেক্ষ অন্তর দিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে– কারা দেশপ্রেমিক আর কারা দেশদ্রোহী। বাবু সংস্কৃতির এ দেশীয় উত্তরাধিকারীরা কলোনির প্রভুদের সেই সিলসিলা আজও বহন করে চলেছেন এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এ দেশের স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সেই 'প্রিয় ভাষণটি' উচ্চারণে দ্বিধা করেন না।

বাঙালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবমুখীনতা কিংবা অতীতচারিতার অভিযোগও আনা হয়ে থাকে। বাঙালি মুসলমানের মন যে কিছুটা আরব অভিমুখী হবে– এ তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ, মুসলমানের আদর্শ ইসলাম অভিমুখী আর ইসলামের বিকাশ আরবদেশেই। সেখানেই ইসলামের নবির স্মৃতি জড়িয়ে আছে, আর আছে ইসলামের পূণ্য-পবিত্র স্থানগুলো। বাঙালি মুসলমানের মানসভূমিতে তাই যেমন দেখতে পাই নারিকেল, সুপারি, কোকিল, শালিক, ডাহুকের ছড়াছড়ি তেমনি মরুদ্যান, লু-হাওয়া, আখরোট, খুবানি বনের মৃদুমন্দ হাওয়া। এ দুটোকেই পাশাপাশি রাখা চাই এবং এতে কোনো দোষ নেই। নারিকেল-সুপারি হচ্ছে আমাদের বাস্তবজীবনের প্রতিধ্বনি; লু-হাওয়া, আখরোট, খুবানি বন হচ্ছে আমাদের মানসিক ঐতিহ্যের কলস্বর। এর মধ্যে অতীতে ফিরে যাওয়ার কী থাকতে পারে? আমরা যখন ইসলামি সমাজের কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তন করি না। ইসলামের আদর্শ ও সম্ভাবনার কথা বর্তমানের প্রেক্ষিতে চিন্তা করে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করার কথা ভাবি মাত্র। অথচ এটিকেই নানা রকম বাকচাতুর্যের আড়ালে বলা হচ্ছে অতীতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা। এটা যদি

সেরকমই হয়, তাহলে পুরো ভারতজুড়ে আজ যে রামরাজত্বের কথা শোনা যাচ্ছে– সেটাকে আমরা কী বলব? অথবা রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ উড়িয়ে দেওয়ার যে ভয়ানক মানবতাবিরোধী ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে, তা কি ভারতের মৌলবাদী হিন্দুদের চূড়ান্ত অতীত মানসিকতার ইঙ্গিত দেয় না?

রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে প্রাচীন ভারতের আদর্শে তপোবন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র '*আনন্দমঠ*' উপন্যাসে আর্য ভারতের আদর্শ তুলে ধরেছেন। জওহরলাল নেহরু তার *Discovery of India* বইতে প্রাচীনকালের অনুসরণে পুরো ভারতব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মানসিক অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন। আর অতি সাম্প্রতিককালের সুদূর ত্রিনিদাদের অভিবাসী সন্তানের পুত্র হিন্দু ধর্মানুসারী ভি. এস. নাইপল তার নানা রকম উপন্যাস ও লেখালিখিতে প্রাচীন হিন্দু আদর্শের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেছেন। অতীতচারিতার অভিযোগ কি এসব ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে? আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। এ দেশের কমিউনিস্টরা সুদূর ল্যাটিন আমেরিকার চে গুয়েভারার বিপ্লব, যুদ্ধ ও সংগ্রামের কথা স্মরণ করে যে রকম মানসিক শক্তি অনুভব করেন কিংবা মার্কস, লেনিন ও মাওসেতুঙের নানা রকম বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতাকে যেরকম শ্রদ্ধা ও প্রেরণার মর্মমূল হিসেবে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিয়েছেন, তাকে কি আমরা দেশজ বলতে পারি? এক্ষেত্রে কোনো দেশপ্রেমহীনতার অভিযোগ এসেছে বলে কখনও শুনিনি। বোধ হয় একালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সহজ এবং অভিযোগকারীরাও বুঝতে পেরেছে, মুসলমানদের তরফ থেকে প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা একেবারেই কম। সুতরাং যত ইচ্ছে তাদের চরিত্র হনন করে যাও।

বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ সেই উনিশ শতকের কাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয়ে মুসলমানের সংস্কৃতি হননের ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে এবং এখন সাম্রাজ্যবাদের বিদায়ের পর বাঙালি সংস্কৃতি ভারতীয় আধিপত্যকামী হিন্দু মানসিকতার সাথে লগ্ন হয়ে বাঙালি মুসলমানের আইডেন্টিটি আর শিকড় নির্মূলের মহোৎসবে মেতে উঠেছে। লক্ষ করুন, গত কয়েক দশকের রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে বাঙালি আছে, ইসলাম নেই। বাঙালিরা যে মুসলমানও বটে, সে কথাটা বাঙালি সংস্কৃতি

স্বীকার করে না। প্রকারান্তরে বাঙালি সংস্কৃতির মানেটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে– ইতিহাসে একটি জাতির মন, মনন, রাজনৈতিক চেতনা বিচারের প্রশ্নে ইসলামকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। গত শতকের সত্তর দশকের শুরুতে বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের তীব্র দাপটের কাল থেকে ইসলাম বর্জন শুরু হয়েছে এবং আমাদের বুদ্ধিজীবীতার ইতিহাসে ইসলামের স্বীকৃতি অনেকখানি এখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এসব বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভাষার গুরুত্বটা মূখ্য; ইসলাম গৌণ। তার মানে এদের কাছে জাতি বিচারের প্রশ্নে ইসলামের ভূমিকাটা শিথিল হয়ে পড়ছে। এই ভাষার দাবির পেছনে মস্ত একটা ফাঁক আছে। ভাষার নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে এরা মূলত কলকাতার বাবু সংস্কৃতিরই পূজা করছে। বাঙালি সংস্কৃতির এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য, হিন্দু হিন্দু থাকতে পারবে, বৌদ্ধ বৌদ্ধ থাকতে পারবে, কিন্তু মুসলমান মুসলমান থাকতে পারবে না। মুসলমান বাঙালি হতে হলে তাকে ইসলাম ছাড়তে হবে। এ কারণেই দেখি এদেশের বাঙালিবাদীরা বাঙালিত্বের সন্ধান করেন ধর্মাশ্রিত বৌদ্ধ চর্যাপদ, দোঁহা ও হিন্দু পদাবলির মধ্যে। কিন্তু মুসলমানের পুঁথি ও কাহিনির মধ্যে তারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়ে আঁতকে ওঠেন। শ্রী চৈতন্যের আন্দোলনের মধ্যে তারা বাঙালি সংস্কৃতির সমন্বয়মূলক বৈশিষ্ট্য খুঁজে ফেরেন; অথচ শাহজালাল-খানজাহানের মধ্যে তারা তখন কিছু দেখতে পান না। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের মধ্যেও তারা বাঙালিত্বের অভিনব আর চমৎকার সব ছবি দেখে সম্মোহিত হয়ে ওঠেন, অথচ সেদিনের হাজি শরিয়তুল্লাহ, তিতুমীর, ফকির মজনু শাহ প্রমুখকে বাঙালি ডাকতে এদের দ্বিধার অন্ত নেই।

এই বিভেদ-বিভাজন বাঙালি সংস্কৃতির দ্যোতক, এই বিচ্ছেদের বীজ বপন করে এরা বাঙালি মুসলমানকে তার সাংস্কৃতিক চৈতন্য থেকে এবং ইসলামের মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়। এই বিচ্ছেদ-বিভাজনের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আজ তাই সমবেত প্রচেষ্টা ও যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃতির বিভাজন

দেশকে মা বলার রীতি ইসলামে নেই। তার ওপর দেশকে দেবী বলে বন্দনা করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। ইংরেজিতে মাদারল্যান্ড বলে যে কথাটা আছে, তার বাংলা এখন মাতৃভূমি। কিন্তু এই মাতৃভমি মাতৃদেবীর মতোন নয়; অনেকটা জন্মভূমির মতোন। পিতৃভূমির অর্থও তাই। মাতৃভূমি, জন্মভূমি, পিতৃভূমি কোনোটিই পূজোর সেন্স বহন করে না। এমন যে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর হিন্দু ধর্ম তাদের শাস্ত্রেও সরাসরি দেশকে সাকাররূপে পূজার কথা বলা হয়নি। হিন্দুশাস্ত্রে জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরিয়সি বলা হয়েছিল। দেশকে প্রতিমা বানিয়ে পূজা করতে হবে- এই ধারণা চালু হয় স্বদেশী আন্দোলনের কালে। বাংলা মা, বঙ্গমাতা, ভারতমাতা এসব শব্দ বাংলা ভাষায় তখন থেকেই চালু হয়েছে। বঙ্গমাতা, ভারতমাতা এসব কি এক-একটা দেবী বা মানবী? যে ধর্মে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর ছড়াছড়ি, তাদের জন্য নতুন একটা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা খারাপ লাগেনি।

হিন্দুরা ধর্ম বলতে দেব-দেবীকেই বোঝে। তাই দেশ হলো নতুন দেবী। এই দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা চাই। স্বদেশী আন্দোলনের কর্তা ব্যক্তিরা এই কথাটা জনগণকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। প্রত্যেকটা আন্দোলনের বা ঘটনার পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক যেমন কারণ থাকে, তেমনি থাকে তাত্ত্বিক কারণ। যা না থাকলে আন্দোলনের জন্য, বিপ্লবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয় না। এই প্রস্তুতি ছাড়া যে আন্দোলন হয় তার নিয়তি মন্দ হয়। ফরাসি বিপ্লবের অনেক কারণ ছিল। এর মধ্যে বিপ্লবপূর্ব মনীষী ভলটেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু, দিদেরা প্রমুখের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এদের লেখালিখি বিপ্লবের জন্য মানুষের মন প্রস্তুত

করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের সাথে প্রকৃতিগতভাবে স্বদেশী আন্দোলনের কোনো তুলনা হয় না। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া। ফরাসি বিপ্লবের মতো এখানেও ছিল তাত্ত্বিক কারণ, এখানকার হিন্দুদের একধরনের মানসিক প্রস্তুতি। ওখানে ভলটেয়ার যা করেছেন, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র *'আনন্দমঠ'* লিখে পুরো হিন্দু জাতির রিভাইভাল এনে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমের পরে এই রিভাইভালের পতাকা উঁচিয়ে ধরেছিলেন শ্রী অরবিন্দ, কতকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ। একটি বই যে একটি জাতির জীবনকে এতখানি ঘুরিয়ে দিতে পারে– *'আনন্দমঠ'* তার বড়ো প্রমাণ।

এ বই যখন লেখা হয়েছিল, তখন ছিল ইংরেজের শাসন। ইংরেজ হিন্দুকেও পরাধীন করেছিল, মুসলমানকেও পরাধীন করেছিল, কিন্তু *'আনন্দমঠ'* পাঠ করলে মনে হবে– যত শয়তানির গোড়া মুসলমান। সুতরাং মুসলমানদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে হিন্দু রাজত্ব পুনর্প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মাতৃদেবীর সন্তানদের একমাত্র লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সেকালের অনেক হিন্দু মনীষীই মুসলমানদের চেয়ে ইংরেজকেই মিত্র মনে করতেন।

দেশকে দেবী বানিয়ে প্রতিমা গড়ে পূজা করার এই চিন্তা-ভাবনা একান্তই বঙ্কিমের নিজস্ব। বন্দে মাতরম সংগীতে আছে– 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী, কমলা কমল দল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী ণমামি ত্বাং।' তার মানে মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী হচ্ছে বঙ্গমাতা। আনন্দমঠের মধ্যে মা জগদ্ধাত্রী ও মা কালীর কথাও আছে। দেশ যেহেতু মুসলমানদের কারণে ধ্বংসপ্রায়, সুতরাং দেশকে উদ্ধারের জন্য মাতৃদেবীর সন্তানরা আগে তাকে পুজো দিয়ে, অর্ঘ্য দিয়ে দেশোদ্ধারে নামতে চান। আনন্দমঠের নিত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবনানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও ধীরানন্দকে দিয়ে এই পুনরুজ্জীবিত হিন্দু ধর্মের মার্টায়ার বিগ্রেড (Martyr Brigade) তৈরি হয়েছে।

বঙ্কিম যে বীজ বুনলেন, তার ফল তুললেন স্বদেশী কর্মীরা, বঙ্কিম যে আগুন জ্বাললেন, তাতে ঘৃতাহুতি দিলেন স্বদেশী সন্তানরা। বঙ্কিমের জীবদ্দশায় তার বন্দে মাতরম সংগীতে সুরারোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান লিখেন। বঙ্কিম যেমন করে তার বন্দে মাতরম সংগীতে এবং *আনন্দমঠ* উপন্যাসে দেশকে প্রতিমা বানিয়ে

পূজার কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের এসব গানেও তারই প্রভাব দেখা যায়। এ সময় লেখা তার 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'যে তোমার ছাড়ে ছাড়ুক', 'সার্থক জনম আমার' প্রভৃতি গানে মা-এর ছড়াছড়ি। এই মা একদিকে বঙ্গমাতা, অপরদিকে মা দুর্গা। এর মানে হচ্ছে মা দুর্গা একদিকে দেশের প্রকৃতির রূপ ধরে প্রকাশিত হন, অন্যদিকে সাকার রূপে তার পূজাও চলে।

বঙ্কিম এখন এক লিজেন্ড। তার ভাবানুসারী স্বদেশী বাহিনীর আত্মত্যাগও হিন্দু ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিসংবাদিত ঘটনা। বিনয়, বাদল, দীনেশ, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনদের আত্মত্যাগের কাহিনিকে ছোটো করে দেখার কিছুই নেই। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয়, তাদের অনুসৃত পথেই ব্রিটিশকে হটিয়ে দিয়ে ভারত স্বাধীন হতো, তবে তো সেটা হতো আনন্দমঠের সন্যাসীদের অভীষ্ট সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাষ্ট্র। সেখানে কি আদৌ কোনো মুসলমানের স্থান সম্ভব ছিল? আর সম্ভব হলেও সে মুসলমানকে অবশ্যই সকাল-বিকাল বন্দে মাতরম ধ্বনি দিতে হতো। এভাবেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রূপান্তর ঘটল সাম্প্রদায়িকতার সম্রাটরূপে।

মুসলমানরা আপসহীন তৌহিদবাদী। একেশ্বরবাদ তাদের ধর্মের মূল কথা। আল্লাহ ছাড়া কাউকে কুর্নিশ করা তাদের ধর্মবিরুদ্ধ। সেই মুসলমান কী করে মা দুর্গা, মা লক্ষী, মা সরস্বতী, মা জগদ্ধাত্রী, মা কালী, ভারতমাতা, বঙ্গমাতা প্রভৃতির বন্দনা করবে? অসম্ভব। এই অসম্ভব সম্ভব হয়নি বলেই ভারতের ইতিহাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব। সেই চাপে মারা যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, একই সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ইতিহাসে দুটি জাতীয়তাবাদই আমরা দেখি– একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদ, অপরটি মুসলিম জাতীয়তাবাদ। সমন্বয়ী বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমন্বয়ী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের ইউটোপিয়ান ভাবনা-চিন্তা মাত্র।

উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জাগরণের সাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের কোনো সংশ্রব ছিল না। সেকালের বড়ো বড়ো হিন্দু মনীষী ও বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানকে সাথে নিয়ে দেশোদ্ধারের কথা ভাবেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তো মুসলমানদের কষে গাল দিয়েছেন। মুসলমানরাই যে সব নষ্টের গোড়া এ কথা বলতেও তিনি দ্বিধান্বিত হননি। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালি

জাতীয়তাবাদ ছিল একই সাথে তার হিন্দু জাতীয়তাবাদ চিন্তার সমার্থক। তিনি যেসব তত্ত্ব প্রচার করেছেন, সেসব মুসলমানের জন্য তো নয়ই, নিম্নবর্ণের হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কারও জন্যই নয়। তার উপন্যাসে শিল্প ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে রাজনৈতিক বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই বড়ো শিল্পী হয়েও একই সাথে ধর্মান্ধ ও মতান্ধ।

বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা বাঙালি জাতি ভাগ হয়ে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার ৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় তাদের বিষাদ পরিণত হয় উল্লাসে। ইতিহাসের দুটি ক্ষণে অথচ একই ঘটনায় এই বিষাদ ও উল্লাসের তাৎপর্য কী? হিন্দু সমাজনেতা ও বুদ্ধিজীবীরা উভয় স্থানেই নিজেদের স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। নেশন কথাটা তারা ব্যবহার করেছিলেন নিজেদের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই। নেশনের স্বার্থ বলতে তারা হিন্দুর স্বার্থকেই বুঝেছেন। ধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্বার্থকে তারা বিবেচনা করেননি।

দ্বিজাতিতত্ত্ব একদিনে আসেনি। জিন্নাহ সাহেবের অনেক আগেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত প্রস্তুত হয়েছিল। বঙ্কিমের, শ্রী অরবিন্দের, স্বামী দয়ানন্দের ভাবানুসারীরা সে কাজটা আগেই সুসম্পন্ন করে রেখেছিলেন। জিন্নাহ সাহেব শুধু রিঅ্যাক্ট করেছিলেন। ক্রিয়া থাকলেই প্রতিক্রিয়া হয়। একজাতিতত্ত্বের বদলে দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেছিলেন তিনি। হিন্দুর বাঁচার অধিকার থাকলে মুসলমানেরও বাঁচার অধিকার থাকবে এই দাবি তিনি করেছিলেন। এতে আর অন্যায় কী? বিচার করে দেখলে তাকেই বেশি ডেমোক্রাট মনে হয়। অন্যরা তার সামনে টেকে না। এমনকি গান্ধীও না, নেহেরুও না। পাকিস্তান ভেঙে যখন বাংলাদেশ বের হয়ে আসে, তখন এখানকার সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সাথে গলা মিলিয়ে বলতে শুরু করেন দ্বিজাতিতত্ত্ব একটা ভুল হিসাব ছিল। বাংলাদেশ হওয়ার ভেতর দিয়ে সেই ভুলটি ইতিহাস সংশোধন করার চেষ্টা করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্ব যদি ভুল হিসাব হয়, তাহলে সেই হিসেবের দায় থেকে বঙ্কিম রেহাই পান না। রবীন্দ্রনাথ রেহাই পান না। রেহাই পাননা কংগ্রেসের সব বড়ো বড়ো জাঁদরেল নেতারা। ভুলের একপ্রান্তে যদি থাকে মুসলিম লীগ, তবে আরেক প্রান্তে আছে কংগ্রেস। একজাতিতত্ত্ব ছিল বলেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা এসেছে– আমরা যেন সে কথা ভুলে না যাই।

এখানে যারা সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত, নিজেদের যারা মুসলমানের চেয়ে বাঙালি পরিচয়ে তুলে ধরতে বেশি উৎসাহী, তাদের দুর্ভাগ্য তাদের বাঙালিত্বও কিন্তু অর্জিত হয়েছে পাকিস্তান হওয়ার পর। একজাতিতত্ত্বের হিসেবে পাকিস্তান হওয়ার আগে মুসলমানরা বাঙালি ছিল না। উনিশ আর বিশ শতকের অনেক হিন্দু সমাজনেতা ও বুদ্ধিজীবীরাই মুসলমানকে বাঙালি বলে স্বীকার করতেন না। শরৎচন্দ্রের মতো মানবদরদী ঔপন্যাসিকও যখন লিখেন– 'স্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমানে ফুটবল খেলা চলিতেছে', তখন মুসলমানদের সম্পর্কে তার ও তার সমধর্মীদের অনুভূতি কী তা লুকোছাপা করে বলার অবকাশ থাকে না।

পাকিস্তানের ২৩ বছর এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর আজতক এখানকার মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের একাংশের অন্তঃপরিবর্তন হয়। এরা মুসলিম সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেন। অনেক মোল্লা-মৌলবির ছেলেরাও হয়ে ওঠে সেক্যুলার। আবুল ফজল, মুনীর চৌধুরীর মতো সাহিত্যিকদের পিতারা ছিলেন রীতিমতো আলেম। কেমন করে এরাই হয়ে যায় মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা। মুক্তবুদ্ধি তো একপ্রকার ধর্মহীনতার শামিল। এমনকি যেসব সাহিত্যিক পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নির্যাতনের মুখে এ পারে পাড়ি জমান, তাদের অনেকে এখানে এসে মুসলিম জাতীয়তাবোধের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজতে শুরু করেন। তারা হয়ে উঠেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তারা ভুলে যান, মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই তারা কিন্তু এখানে আসতে পারেন এবং বসতি গড়েন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে আশ্রয় করে তারা পশ্চিমবঙ্গে ঠিকানা গড়তে পারেননি। এদের একজন হচ্ছেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি এখানে এসে একটা বই লিখেন, এর নাম '*সাম্প্রদায়িকতা*'। ভাবতে অবাক লাগে, তার মতো শিক্ষিত ও জানাশোনা ব্যক্তি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পান। এই বিরাট ভারতবর্ষ জুড়ে কত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে দেশভাগের মতো প্রলয়ংকরী ঘটনা ঘটে গেল, সে কি শুধুই মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার কারণে? এই একমার্গী চিন্তা-ভাবনাও এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা। বদরুদ্দীন উমর সাহেবের এ বই এখানকার সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের প্রীতির কারণ হলেও ইতিহাসের জন্য তা মোটেই সুখকর হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালে হিন্দুরা কৌতুক করে বলত 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়'। পাকিস্তান হওয়ার পর এই মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে ধর্মনিরপেক্ষতার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। মরহুম নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুর দরিদ্র মুসলমানদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এই দরিদ্র মুসলমানের ছেলে-পেলেরাই শিক্ষিত হয়ে কেউ কেউ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে ধর্মনিরপেক্ষতার সাধনা শুরু করেন। এখানকার কোনো কোনো শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি যায় পালটে। মোফাজ্জল হায়দার, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রাশিদুল হাসান, আহমদ শরীফ, আবদুর রাজ্জাক। শেষের জন এদের সবার গুরু। যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানরা দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণার সমর্থক হয়, এক প্রজন্মের মধ্যে তাদের ছেলে-পেলেরাই কেউ কেউ মুসলিম সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের কথা শুনে নাক সিটকান। এসব বুদ্ধিজীবীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে ছাত্রদের ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলেন আর প্রচার করেন– তারা আগে বাঙালি, তারপরে মুসলমান। এইভাবে মুসলিম সংস্কৃতির ভিত দুর্বল হয়। এক প্রজন্ম আগে যে মুসলমানরা এই হিন্দু রিভাইভালের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল, এক প্রজন্ম পর তাদের ছেলে-পেলেরাই সেই হিন্দু রিভাইভালের চেতনাকে বুকে টেনে নিচ্ছে। ইতিহাস মাঝে মাঝে কৌতুকও করে!

এখানকার সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝেন– ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য সব ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করা। আর সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝেন– মুসলমানের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার সংরক্ষণ করা। তাই রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু মুসলমান মওলানা আকরম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ প্রমুখ তাদের হিসেবে সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম স্বাধীনতা সংগ্রামী; তিতুমীর, হাজি শরিয়তুল্লাহ প্রতিক্রিয়াশীল।

ইংরেজের দুশো বছর ধরে বাঙালি মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য লড়াই করেছে। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর এদেরই একদল ইংরেজের লেখাপড়া নিয়ে স্বাতন্ত্র্যহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর কারণ কী? ভৌগোলিক উপনিবেশ এখন আর তেমন নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অন্যভাবে

টিকে আছে। এরা সৃষ্টি করেছে মনোজাগতিক উপনিবেশ। এটি আরও মারাত্মক। ভৌগোলিক উপনিবেশ চিহ্নিত করা যায়, মনোজাগতিক উপনিবেশ সহজে চেনা যায় না। সাম্রাজ্যবাদ তার নীতি ও দর্শন দিয়ে পুরোনো উপনিবেশগুলোর শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একাংশকে বেঁধে ফেলেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় প্রতিনিধি। এরাই একালের ক্লাইভ, বেন্টিংক। এদের ধর্ম সেক্যুলারিজম। এদের সংস্কৃতি এখানে আধুনিকতা– মানে পশ্চিমের খ্রিষ্টান ও কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সংস্কৃতির মিল-মিশাল দেওয়া এক মূল্যবোধ। ইসলাম এদের কাছে একান্তই গৌণ বিষয়। এই যে স্বাতন্ত্র্য থেকে স্বাতন্ত্র্যহীনতার দিকে যাত্রা, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিহীনতার দিকে পথ চলা– এটাই বোধ হয় একালের বাঙালি মুসলমানের সবচেয়ে বড়ো সংকট; এক অর্থে বিপর্যয়ও বলা যায়।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনেকদিন পার হয়ে গেলেও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে আজতক আমাদের কোনো ফয়সালা হয়নি। এ কারণেই অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইঙ্গিত ফল আমরা তেমন কিছু পাচ্ছি না। একটু গভীরভাবে মাথা খাটালেই বোঝা যাবে, এর কারণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরাধীনতা।

স্বাধীনতা কিংবা পরাধীনতার পুরোনো দিনের সংজ্ঞা এখন আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীনতা কিংবা পরাধীনতার ডাইমেনশনও এখন একমাত্রিকতার স্থলে বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা হরণ করতে হলে এখন পুরোনো দিনের কায়দায় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেশ দখল না করলেও চলে। সে সূত্রেই সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কারণ, এ দুটি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা কোনোভাবেই কার্যকর হতে পারে না।

দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহ তাদের পুরোনো অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেশ দখলে রাখার ঝুঁকি অনেক। এতে দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে এবং সেই যুদ্ধ সামাল দেওয়া বেশ কঠিন। তাই তারা একালে নিজেদের আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করতে এসব দেশে সামরিক উপনিবেশের বদলে মনোজাগতিক উপনিবেশ তৈরিতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এসব উপনিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে দেশে একদল হীনম্মন্যতাবোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা– যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে আধিপত্যবাদী শক্তির চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির পায়রাবী করা। স্বাধীনতা মানে জাতীয় সংস্কৃতি ও

মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। কিন্তু এই হীনম্মন্যতাবোধসম্পন্ন লোকগুলো জাতীয় সংস্কৃতির ভিতকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য অনুকরণ, শিকড়হীনতা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতা এমনভাবে সমাজের ভেতর ছড়িয়ে দেয় যে– জাতীয় কৃষ্টি, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। কোনো দেশের সংস্কৃতিতে এরকম বেহাল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে সেখানে অনায়াসে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। এ কারণে আধিপত্যবাদী শক্তি একালে দেশ দখলের বদনাম না নিয়ে প্রথমে অন্য সংস্কৃতির ভেতরে ঢুকে ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতির অন্তঃচরিত্র পরিবর্তন করে ফেলার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে একদল বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সমাজের নানা শ্রেণি ও পেশায় কর্মরত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা। এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এখন নিজেরা এসে জাকিয়ে না বসলেও চলছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতেও আজ চলছে অনুকারিতা ও হীনম্মন্যতার চর্চা এবং তার সুবাদে আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে একধরনের বিবাদ লাগিয়ে জাতিকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে।

মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে একটা আদর্শমূলক সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির গোড়ার কথা হচ্ছে– ইসলামি জীবন-দর্শন ও মানবতাবাদ। তাই ইসলামি সংস্কৃতির সাথে জাতি, দেশ, ভাষা ও বর্ণের ওপর ভিত্তি করে যেসব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার সাথে অনেক তফাত রয়েছে। আল কুরআনের নীতি ও মূল্যবোধ এবং হযরত রসুল সা.-এর জীবনব্যাপী সাধনার নমুনা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভিত্তি। সেই হিসেবে মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে সর্বজনীন, দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানই হচ্ছে এই সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। ভাষা কিংবা ভূগোলের দূরত্বের কারণে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক প্রভৃতির মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেমন আল্লাহর একত্ব, নবি-রসুল, আখিরাত প্রভৃতিতে বিশ্বাস সবকিছুই অপরিবর্তিত থাকে। মুসলিম সংস্কৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম, বাংলাদেশের মুসলিম, চীনের মুসলিম, ইউরোপের মুসলিমের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তেমনি ইসলামের শিক্ষা হলো জন্ম, বংশ ও সামাজিক মর্যাদার কারণে কোনো ভেদজ্ঞান করা চলবে না। তবে অস্বীকার করা যাবে

না মুসলিম সমাজের মধ্যে অনেক রকমের অনাচার ও পার্থক্য চেতনা ঢুকে পড়েছে। এটি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের স্বার্থপরতার কারণে। এর সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই আদর্শ ও মূল্যবোধ আশ্রিত সংস্কৃতি বিশ্বজুড়ে মুসলিম সংস্কৃতির একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে। এই বন্ধনের নাম হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ। বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে এই বিশ্বব্যাপী বন্ধনের একটি জোড়।

এই জোড় ভাঙার জন্য আমাদের এখানকার একদল হীনম্মন্যতাবোধসম্পন্ন মানুষ বাঙালি সংস্কৃতি নামক একপ্রকার মনগড়া, মূল্যবোধহীন সংস্কৃতির থিউরি আওড়ান। এরা বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ অবদানে গঠিত বাঙালি সংস্কৃতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতে চান। এদের জাতীয়তার ভিত্তি বাংলা ভাষা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি পরিচয় নির্ণয়ে তারা ইসলামের পরিবর্তে বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্বের ওপর অগ্রাধিকার নেন। এটা করতে যেয়ে তারা প্রাক-মুসলিম কালের অমুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে নিজেদের বলে আত্মস্থ করে নেন। এ কারণেই তারা বলে থাকেন– তারা আগে বাঙালি, তারপরে মুসলমান। এইভাবে তাদের কাছে ইসলামের ভূমিকা নগণ্য হয়ে পড়ে; মূখ্য হয়ে যায় ভাষার ভূমিকা।

এদের জাতিত্বের পক্ষে যুক্তি হলো– আমরা যেহেতু একই ভাষায় কথা বলি, একই রকম ভাত, ডাল, শাক, বেগুনভর্তা, পিঠাপুলি, পান-সুপারি খাই, আমাদের পোশাক-আশাকেও যেহেতু তেমন একটা পার্থক্য নেই, সুতরাং বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতি। তাদের এই সাংস্কৃতিক ঐক্য ১৯৪৭ সালে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের ফলে বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কখনও বলতে পারেননি– ১৯৭১ সালে যখন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যকামীদের দূরবস্থা চলছে, চারিদিকে কেবল বাংলা ও বাঙালিত্বের জয়জয়কার, তখন কেন অখণ্ড-অবিভাজ্য বাংলা গড়ে উঠল না? তারা এটাও বলতে পারেন না, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা কেন হিন্দুত্ব ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোহ কাটিয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের সাথে এসে মিলিত হলেন না? তাহলে দেখা যাচ্ছে– শুধু জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Ethnicity) যেমন ভাষা ও খাদ্যাভ্যাস দিয়ে আমাদের এখানে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারেনি, তেমনি দেখা যাচ্ছে– অমুসলিম প্রভাবিত বাংলাদেশের যে লোক-সংস্কৃতির ধারা, তা দিয়েও জাতীয়তাবাদ নির্মাণ করা যায়নি।

এখানকার জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মে। সেটি ঐতিহাসিক কাল থেকেই হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে– যা পরবর্তীকালে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একটা জিনিস বোঝা দরকার– সাংস্কৃতিক পার্থক্য তৈরি হয় সাংস্কৃতিক দর্শনের পার্থক্যের জন্য। এই দর্শনের কারণেই সংস্কৃতির অভিমুখ, জাতীয়তাবাদের অভিমুখও ভিন্ন হয়। বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি সত্তা, বাঙালি ঐতিহ্য, বাঙালি জাতির নামে একজন তৌহিদবাদী মুসলমানের পক্ষে কি কখনও প্রাক-ইসলামি ঐতিহ্য লিঙ্গপূজা, যোনিপূজা, মন্দিরের দেবদাসী ঐতিহ্য, রামলীলা, শিবের গাজন, শঙ্খ, উলুধ্বনি, ঢাকের বাদ্য, কাসার ঘণ্টা, মঙ্গল প্রদীপের ধারণা আত্মস্থ করে নেওয়া সম্ভব?

অথচ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির নামে এ সমস্ত শিরক-বিদআত আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করার চেষ্টা চলছে। এসবই মনোদাসত্বের অভিব্যক্তি। এর একটাই উদ্দেশ্য– আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমূলে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়ে আমাদের ঐক্য ও সংহতি চেতনাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া। বাঙালি সংস্কৃতির বেনোপানি এখন আমাদের অস্তিত্বের গায়ে কাদা লেপে দিয়ে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। এর লক্ষ্য পরিষ্কার– আমাদেরকে নাম-পরিচয়হীন করে তোলা, আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

ভাষাভিত্তিক উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতির কথা বলে এখন আমাদের শোনানো হচ্ছে, রবীন্দ্র সংগীত শ্রবণ নাকি ইবাদতের মতো। অন্যদিকে প্রতিবেশী সমাজের অনুকরণে এখানকার কেউ কেউ সকল রকমের সভা, অনুষ্ঠান ও কাজের সূচনা করছেন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে।

রবীন্দ্র দর্শনের সারাৎসার আহরিত হয়েছে উপনিষদ থেকে। তার গানগুলোতে এই উপনিষদীয় দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট। এখন যৌথ বাঙালি সংস্কৃতির নামে মুসলমান কি তৌহিদের দর্শন বাদ দিয়ে উপনিষদের দর্শন গ্রহণ করবে অথবা যে মুসলমান 'বিসমিল্লাহ' বলে সব কাজ শুরু করে এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে, সে কী করে হিন্দু পূজার অনুকরণে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গল প্রার্থনা করবে? যৌথ সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে এখন

যদি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের বলা হয় 'বিসমিল্লাহ' বলে কাজ শুরু করতে কিংবা নজরুল ইসলামের ইসলামি গানগুলোকে তাদের প্রার্থনার সমতুল্য হিসেবে মর্যাদা দিতে– তাহলে তারা কি রাজি হবে? এ ব্যাপারে আমাদের বাঙালিবাদীদের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অবশ্য আমরা পাইনি। প্রকৃতপক্ষে যৌথ সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি বা একজাতিত্বের কোনো ঐতিহাসিকতা নেই। মধ্যযুগে বাঙালি শব্দটা ব্যবহৃত হতো দেশবাচক অর্থে। জাতিত্বের নির্ণায়ক ছিল ধর্ম। উনিশ শতক থেকে বাঙালি শব্দটা ব্যবহৃত হয় জাতি অর্থে, কিন্তু সেই জাতি ছিল হিন্দুত্বের ধারক। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী মুসলমান হিন্দু নেতৃত্বাধীন এই জাতিত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। আজকাল আমরা যে অসাম্প্রদায়িক, সেক্যুলার বাঙালি সংস্কৃতির কথা শুনি, তার মধ্যেও কিন্তু হিন্দুত্বের প্রবণতাগুলো প্রধান। সেদিক দিয়ে এর একটি সাম্প্রদায়িক রীতি-বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এর ওপর একটি অসাম্প্রদায়িকতার লেবেল চড়িয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানকে কৌশলে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

আমাদের মনে রাখা চাই– সংস্কৃতিগত বিভাজনের কারণেই ভারত ভাগ হয়েছে, বাংলা ভাগ হয়েছে। স্রেফ মানুষের ভাষা-চেতনা কিন্তু এই বিভাজনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আবার বাংলাদেশের মানুষের স্বতন্ত্র ইসলামি চেতনাই বাংলাদেশকে ভারত থেকে পৃথক করে রেখেছে। তাই ইসলামি চেতনা দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দুর্বল হয়ে পড়বে। কাজেই বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে হবে ইসলামের মধ্যে। আবার ইসলামকে ভিত্তি করেই এর সংস্কৃতির নবনির্মাণ করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অর্থ বিফল হয়ে যাবে।

সাংস্কৃতিক বহুত্ব

এক.

সাংস্কৃতিক বহুত্ব (Cultural Pluralism) শব্দটা পশ্চিমি গণমাধ্যমের জোরে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং হালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ নিয়ে একটা সংবেদনা সৃষ্টি হয়েছে। প্লুরালিজম, সেক্যুলারিজম, ন্যাশনালিজম প্রভৃতি ধারণা আমরা পেয়েছি পশ্চিমের সূত্রে। মজার কথা হলো, এসব ধারণা এখন আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের গভীরে ঢুকে পড়লেও আদপে এসব মর্মবস্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিকতার দ্বারা আরোপিত এবং আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তা কতখানি প্রাসঙ্গিক– সেটাও ভাববার বিষয়। যে বিতর্ক ইউরোপ-আমেরিকায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে, তা আমাদের মতো পশ্চাৎপদ পুঁজি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার দেশে এবং ভিন্ন চরিত্রসম্পন্ন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় চলতে পারে কিনা– তাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

আবার উলটো চিত্রও দেখি। গত একশ কী দু'শ বছরে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ফলে এসব চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে পড়েছে এবং এসব চিন্তা-ভাবনা চর্চায় তাদের উৎসাহও কম নয়। এই যে বিতর্কের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে– আমাদের মতো একদা সাম্রাজ্যবাদ শাসনাধীন দেশগুলোর ক্ষেত্রে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করব কি করব না, আধুনিকতাকে নেব কি নেব না এই দ্বিধার জন্ম সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের ফলে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সমাজব্যবস্থাকে এতখানি বিকৃত ও বিপর্যস্ত করে গেছে যে, এর স্বাভাবিক চলমানতা অনেকখানি আটকে গেছে। এ কারণেই আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী আজও মনে করেন সাম্রাজ্যবাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের সমাজ যদি নিজের শক্তিতেই

বিবর্তিত হতো তবে এরকম সংশয় ও মূঢ়তার অবস্থা তৈরি হতো না। তাই আজও দেখা যায়– আমাদের এখানে আধুনিকীকরণ (Modernisation) ও আধুনিকতার (Modernity) ধারণার মধ্যে একটা ভেদরেখা তৈরির চেষ্টা। কারণ, আধুনিকতার ব্যবহারিক যৌক্তিক ভাষ্যের সঙ্গে এর নান্দনিক সাংস্কৃতিক ভাষ্যের প্রভেদটা অত্যন্ত মোটা দাগে চিহ্নিত করা সম্ভব। যেমন ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা। আসলে এই স্লোগান যতই শ্রুতিমধুকর হোক না কেন, পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে এই সাম্যের ধারণা স্রেফ নামকাওয়াস্তা সাম্যে পরিণত হয়েছে এবং অবস্থান ও দেশভেদে এই সাম্যের স্লোগান রূপান্তরিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও জুলুমে।

সাংস্কৃতিক বহুত্ব সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বহুত্ব সম্বন্ধে আমাদের এখানকার কারও কারও বিভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। এরা মনে করেন বহুত্ব মানে হলো– All Cultural position are equal. পৃথিবীতে যেহেতু বহু সংস্কৃতি আছে এবং প্রত্যেক সংস্কৃতির বিকাশ লাভের অধিকার আছে, তাত্ত্বিকভাবে এসব কথার সাথে দ্বিমত করার তেমন কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অধিকতর ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের কায়েমি স্বার্থের অভিসন্ধি ও ক্ষমতার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে দুর্বল দেশ ও সমাজগুলোর ওপর এক দমনমূলক সংস্কৃতি প্রসারের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং সেটিও হচ্ছে সাংস্কৃতিক বহুত্বের নামে। যেমন করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলেই সাম্রাজ্যবাদীরা আজকাল অন্য দেশ ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। ইরাকের অবস্থা দেখুন।

পশ্চিমের চিন্তা-ভাবনার একটা বড়ো ক্রটি হলো– তাদের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও মানবীয় সত্য সম্পর্কে একটা প্রভুত্ব ব্যাঞ্জক বোধ এবং এই বোধ থেকেই আসে বহুত্ব সম্পর্কে অনাস্থা, অন্যের বিকাশ লাভের অধিকার সম্বন্ধে উদাসীনতা। আঠারো-উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের White Men's Burden কিংবা Civilising Mission-এর অন্তর্গত মর্মবস্তু এবং আজকালকার পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রচারিত বিশ্বায়ন, TINA (There is no alternative) অথবা ইতিহাস ফুরিয়ে যাওয়া তত্ত্বের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। এর প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য হচ্ছে– প্রথম বিশ্ব

কর্তৃক বাকি বিশ্বকে শাসন ও শোষণ করার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈধতা দেওয়া। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সাংস্কৃতিক বহুত্বের উপাখ্যানও শেষ বিচারে পরম প্রাপনীয় কোনো সমাধান নয় যে– এর মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ হবে সুরক্ষিত।

দুই.

বহুত্ব আর বৈচিত্র্য হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। বহু জ্ঞানী-গুণী-দার্শনিক মনে করেন, দুনিয়ার যে ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা কাজ করছে, তার কিন্তু বিভিন্নভাবে প্রকাশ ঘটছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সরল থেকে জটিল দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসই পারস্পরিক ঐকতানের ভেতর দিয়ে সহাবস্থান করছে। সামাজিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় একটি সমাজে নানা মত ও পথের লোক বাস করে এবং নানা রকম রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সহাবস্থানে সেই সমাজ সচল হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিকভাবে বিচার করলে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের যে ফুল দুনিয়া জুড়ে ফুটে আছে, তা রীতিমতো অভাবিত। দেখা গেছে, এক সংস্কৃতিতে যা চলে, অন্য সংস্কৃতিতে তা নিষিদ্ধ বা অনুপস্থিত। পেরুর লোকেরা যখন আলু খেত, তখন মেক্সিকোর লোকেরা আলু খায়নি। ভারতে যখন মুসলমানরা এলো, তখন তাদের নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস তৈরি হলো– যা স্থানীয়দের পক্ষে গ্রহণ করা ছিল তাদের বিশ্বাসের জন্য গর্হিত। গ্রিকদের স্থাপত্যশৈলীর সাথে আরবদের স্থাপত্যশৈলীর কোনো মিল নেই। গ্রিক সাহিত্যে ট্রাজেডি হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা; অথচ অন্য একটা সংস্কৃতিতে গেলে দেখা যাবে কমেডি ছাড়া সেখানে কিছু ভাবাই যায় না।

এই বৈচিত্র্য তৈরি হয় সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে। কেননা, প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আবার একাধিক সমাজ কখনও কখনও বিশেষ সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্যকে ভাগ করেও নেয়। সংস্কৃতির পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি তাদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারও আছে। এইভাবে একটি সংস্কৃতি আরেকটি সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে, আবার পরস্পরকে পুষ্টি জোগায়। এমনি করে সংস্কৃতির স্রোত এগিয়ে চলে। একালে বহুত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা অনেক পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা প্রচার

করেছেন সত্য, কিন্তু সেখানকার মাটিতেই আবার আত্মকেন্দ্রিক ও উচ্চমূল্য এক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটেছে গত কয়েক শতাব্দী ধরে– যার মূলে আছে অন্যের সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক অবিমিশ্র অবজ্ঞা। দুয়েকজন পণ্ডিত যা-ই বলুন না কেন, এই অবজ্ঞা মিশ্রিত মানসিকতাই পাশ্চত্যের মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই অবজ্ঞা সবচেয়ে স্থূল অভিব্যক্তি লাভ করেছিল সাম্রাজ্যবাদের কালে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত উপনিবেশের মানুষগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদীরা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল, তা কোনোমতেই বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়যুক্ত ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের কালে ঔপনিবেশিক প্রভুদের সক্রিয় সমর্থনে গড়ে উঠেছিল প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা এবং এই সব প্রাচ্যবিদরা প্রাণপণ প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন, উপনিবেশগুলোর ইতিহাসে ইতিবাচক বা গৌরবময় কিছু থাকতে পারে না। তাই তাদের কাছে অপাশ্চাত্য সব সংস্কৃতি ছিল নিকৃষ্ট। এই ধরনের উন্নাসিকতা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছিল সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক শোষণের যৌক্তিকতাকে বৈধতা দেওয়া। ভারতীয়দের সম্পর্কে লর্ড মেকলের মতামত এর নমুনা হিসেবে হাজির করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি :

> সংস্কৃত বা আরবিতে আমার কোনো জ্ঞান নেই। তবে তাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণের জন্য যা করার তা আমি করেছি। .... প্রাচ্য জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মূল্যায়ন গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত। আমি তাদের মধ্যে এমন একজনকেও পাইনি, যিনি একথা অস্বীকার করতে পারেন যে, একটা ভালো ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের এক তাকের তুল্য হলো ভারত ও আরবের সমগ্র স্থানীয় সাহিত্য।....

এখন আমাদের সামনে প্রশ্নটা আসলে এই যে, আমাদের যখন এই ভাষা (ইংরেজি) শেখানোর ক্ষমতা আছে, তখন কি আমরা এমন সব ভাষা শেখাব– যাতে আমাদের সঙ্গে তুলনীয় কোনো বই নেই বলে সর্বজন স্বীকার করেন। যখন আমরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান শেখাতে পারি, তখন কি আমরা এমনসব পদ্ধতি শেখাব– যা ইউরোপীয় পদ্ধতির সঙ্গে যেখানে মেলে না, সর্বস্বীকৃতভাবে সেই অমিল খারাবের দিকে। যখন আমরা যুক্তিসঙ্গত দর্শন ও সত্য ইতিহাসের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারি,

> তখন কি আমরা জনসাধারণের পয়সায় এমন চিকিৎসাতত্ত্ব সমর্থন করব– যা ইংল্যান্ডের অশ্ব পরিচর্যাকারীকেও হার মানাবে! এমন জ্যোতির্বিদ্যা সমর্থন করব– যা ইংলিশ বোর্ডিং স্কুলের মেয়েদেরও হাসিয়ে ছাড়বে। এমন সব ইতিহাস সমর্থন করব– যা বিশ ফুট লম্বা রাজা আর ত্রিশ হাজার বছর রাজত্বের গল্পে পূর্ণ। এমন ভূগোল সমর্থন করব– যাতে কেবল রয়েছে মিষ্টির সাগর আর ক্ষীর সমুদ্রের কথা।[১]

এই ধারণা মূলত পৃথিবীকে বিভাজিত করে ফেলেছে– মূখ্য নিজেরটায় এবং গৌণ অন্যেরটায়। একটি শাসন করবে, অন্যটির শাসিত হওয়াই হবে নিয়তি। যে ফ্রান্সে একসময় রব উঠেছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার, সেই ফ্রান্সই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে তার অধীন উপনিবেশগুলোর সাংস্কৃতিক চরিত্র পালটে ফেলতে এবং সেখানকার মানুষদের কৃষ্ণাঙ্গ ফরাসি বানিয়ে তাদের ফরাসি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করতে চেয়েছে। আসল কথা হলো– পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো বহুত্বের কথা জোরে-শোরে প্রচার করলেও উপনিবেশগুলোতে বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার বদলে তারা এককেন্দ্রিক একটি ব্যবস্থা, শাসন ও চিন্তা-ভাবনা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। একালেও তৃতীয় বিশ্বে– বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার ওপর এরা নানা কৌশলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখছে না।

বিশ্বায়নের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়ার প্রভাব এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রভুসুলভ মনোবৃত্তিকে এড়িয়ে চলা গরিব ও প্রাযুক্তিকভাবে অনগ্রসর দেশগুলোর জন্য রীতিমতো দুঃসাধ্য কাজ হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তের বাস্তবতা হলো– পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের তোপের মুখে অপশ্চিমি বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিপন্নপ্রায়। জগতে বিভিন্ন জাতির শরিকানা মানবিক ও সমতাভিত্তিক হওয়ার বদলে বিরোধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রই যেন প্রস্তুত হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই বহুজাতিক সমাজের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এক অসহনশীলতার মনোভাবকে উসকে দিয়ে। যেমন– আজকের ফ্রান্সের সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সংখ্যাগুরু খ্রিষ্টানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব

---

১. *Minute on Education* (1835) by Thomas Babington Macaulay.

এই দুই সংস্কৃতির সহাবস্থানকে কষ্টসাধ্য করে তুলেছে। এই অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দাঙ্গায়। অন্য সংস্কৃতির প্রতি এমনতর বিরূপতা যথার্থ বহুত্ববাদ চর্চার সম্ভাবনাকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং পাশ্চাত্যের বহুকথিত সেক্যুলার মানবিক সমাজের তত্ত্ব যে কত ফোঁপরা, তা ভয়ানকভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে।

পাশ্চাত্যের এরকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের নমুনা আরও দেওয়া যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি যে প্রতিকূল ধারণা পোষণ করা হয়, তা কিন্তু একধরনের সাংস্কৃতিক অসূয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের কখনোই মার্কিন সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এখনও মানবাধিকারের সবচেয়ে বেশি স্লোগান উচ্চারণকারী দেশটিতে রেড ইন্ডিয়ানদের জীবন নির্বাহ করতে হয় রিজারভেশন-সংরক্ষিত এলাকায়। পাশ্চাত্যের আরেকটা জিনিস নিয়ে সেখানকার মানুষ রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবের পর থেকে গর্ব করে আসছিল। তাদের দাবি- তারা ধর্মকে রাষ্ট্র ও গণজীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং দেশের জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্যের এই দাবি কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে বসে আমাদের চোখের সামনে বসনিয়ায় যে পরিকল্পিত মুসলিম নিধনের ঘটনা ঘটেছে, তা কিন্তু সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বহাল থাকা অবস্থায়ই সম্ভব হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টানদের সাথে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো এক ধরনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে একই রকম ব্যবহার তারা করতে ইচ্ছুক বলে মনে হয় না। এসব উদাহরণ থেকে মুসলমানদের প্রতি বিরূপতার বিষয়টি যেমন বোঝা যায়, তেমনি বহুল আলোচিত পশ্চিমের সেক্যুলার রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে যথার্থ বহুত্ববাদের কোনো জায়গা আছে কিনা- তাও একটা বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিন.

এখন আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে চোখ ফেরাই। এটি কখনোই এক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল না। এখানকার একত্ববোধের প্রেরণা এসেছে মূলত ধর্ম থেকে। যেমন- হিন্দু ভারত কিংবা মুসলিম ভারত। ভাষাগত কিংবা জাতিরাষ্ট্রের বিচারে এর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা একান্তই অসম্ভব। রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল একবার মোঘল

আমলে আরেকবার ইংরেজ আমলে, কিন্তু এই ঐক্যটাও তৈরি হয়েছিল মোঘল বা ব্রিটিশ শাসন আরোপিত এক ঐক্য থেকে। সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা ভারতবর্ষের একটা বৈশিষ্ট্য বটে; কিন্তু সাংস্কৃতিক বহুত্ব বলতে যা বোঝায়-যেমন পৃথক সংস্কৃতির সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সহনশীলতার ব্যাপারটা, তা কিন্তু সব সময় এখানে দেখা যায়নি। আল-বেরুনির *'কিতাবুল হিন্দ'*-এ ভারতের বর্ণভেদমূলক সমাজের যে বর্ণনা আছে, তা মোটেই সাংস্কৃতিক বহুত্বের সমার্থক নয়। এই ধরনের বর্ণভেদমূলক সমাজ শুধু পৃথক সংস্কৃতির সহাবস্থানকেই অস্বীকার করে না; নির্মূলও করতে চায়। এর সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সংস্কৃতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

মুসলমানরা ভারতে আসার পর মুসলিম সুলতান ও বাদশাহরা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাননি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতির দিক দিয়ে তারা এক ধরনের সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহী ছিলেন। যে আওরঙ্গজেবকে ধর্মান্ধ বলে দোষারোপ করা হয়, তার বিরুদ্ধেও কিন্তু হিন্দুদের অধিকার হরণের অভিযোগ ইতিহাসবিদরা হাজির করতে পারেননি। কার্যকর অর্থেই মুসলিম শাসনামলে ভারতে বহু সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তিতে এক বহুত্ববাদী সমাজ কাঠামো গড়ে উঠার পরিবেশ ছিল। এই বহুত্বের মধ্যেই প্রভেদ দেখা দেয় ইংরেজ আমলে। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে হিন্দুকে কোলে টেনে নেয় এবং মুসলমানকে পায়ে দলার চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তা সম্বন্ধে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে ভারতই ভাগ হয়ে যায়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও সেখানে প্রায়ই হিন্দুদের জঙ্গি প্রকাশ ঘটে এবং হিন্দুত্ববাদীরা বিভিন্ন সময় ক্ষমতায়ও চলে আসে। সেক্যুলার বলে পরিচিত কংগ্রেসও হিন্দুত্বের সংক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি (যেমন- প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বাবরি মসজিদ এলাকায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করেছিলেন, আরেক প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সময় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল)। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে দাবি করলেও কার্যক্ষেত্রে এটি ধর্মনিরপেক্ষ নয় এবং এর শাসকরা বহুত্ববাদী মত লালন করার পক্ষপাতীও নয়। অযোধ্যা, গুজরাটের পরিকল্পিত মুসলিম নিধন এর বড়ো প্রমাণ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা ধর্মের প্রবেশ ও সেক্যুলারিজমের নীতি বিসর্জন দেওয়াকে বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বলে মনে করেন, তারা ভুল বলেন। সেক্যুলারিজম পশ্চিমে বহুত্ববাদী সমাজ নিশ্চিত করতে পারেনি। সেখানে মুসলমানরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। ভারতের কথা নাই-বা বললাম। আরব-রাষ্ট্রনায়করা একসময় ভেবেছিলেন, সেক্যুলার আরব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বোধ হয় তারা ইজরাইলকে মোকাবিলা করতে পারবেন। কিন্তু পারেননি। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইজরাইলের হাতে বারবার আরব নেতৃবৃন্দ নাস্তানাবুদ হয়েছেন। উলটো আরব জাতীয়তাবাদ আরবদের কোনোরকম ঐক্যই তৈরি করতে পারেনি; বরং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের স্থায়ী বীজতলা তৈরি করে দিয়েছে। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের প্রতি ইজরাইলের জুলুম ও অবিচারকে একভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু জর্দানি শাসকরা যখন ফিলিস্তিনিদের ওপর একইরকম গুলিবর্ষণ করে, তখন তাকে কী বলা যায়? আরবরা যখন সেক্যুলারিজম, গোত্রতন্ত্র, শেখতন্ত্র, আরববাদ দিয়ে ইসলামকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, তখন থেকেই তাদের ভালোমতো বিপর্যয় শুরু হয়েছে। এর থেকে আমাদের এখানে যারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবেন, তারা শিক্ষা নিতে পারেন।

চার.

এ আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম– সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক। কিন্তু তা সহজে গ্রহণযোগ্য হয় না, বিশেষ করে প্রভাবশালী সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে অস্বীকার করতে চায়। সংস্কৃতির মধ্যে কখনও কখনও সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে ঠিক, কিন্তু কখনও কখনও তা সূচনা করেছে বিরোধের। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অন্যের সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে, অন্যের সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করে, প্রয়োজনে বদলে ফেলার তাড়নাও অনুভব করে। বহু সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাই এখনও সাম্রাজ্যবাদ একটা বড়ো অন্তরায়। আমাদের শিক্ষিত ও আধুনিকতাবাদীদের ভেতরে একটা ভুল ধারণা আছে– ইসলামের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো প্রকার মূল্যচেতনা

অনুপস্থিত। এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার-প্রোপাগান্ডা আমাদের আধুনিকতাবাদীদের মন-মস্তিষ্কে এমন জবরদস্ত ছাপ ফেলে দিয়েছে যে, তা তারা অবলীলায় বিশ্বাসও করে ফেলেছে। পশ্চিমের বর্ণবাদী প্রচার-প্রোপাগান্ডা ইসলামকে যতই কুৎসিত ধর্ম হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা করুক না কেন, ইসলামের মাহাত্ম্য, সর্বজনীন মানবতাবাদ, সহিষ্ণুতার ধারণার তুলনা ইতিহাসে বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতের বড়ো বড়ো পণ্ডিত স্বীকার করেছেন– আহলুল কিতাবদের প্রতি ইসলামের যে সহনশীলতা ছিল, তা সমসাময়িক খ্রিষ্টানজগতে কল্পনাও করা যেত না।

উমাইয়াদের স্পেন, আব্বাসীয়দের বাগদাদ, তুর্কিদের ইস্তাম্বুল অর মোঘলদের দিল্লি ছিল নানা ধর্মের মানুষের সহবস্থান ও সম্প্রীতির প্রাণকেন্দ্র। এসব মুসলিম রাজধানীগুলোতে ইসলামের মানবতামুখী মনন ও প্রাণচাঞ্চল্যের মিলিতভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিল সকল ধর্মের মানুষ। বহুত্ববাদী সমাজের সত্যিকার রূপ এসব মুসলিম রাজধানীগুলোতেই দেখা গেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলাম যে সহনশীলতা দেখিয়েছে, তার কাছাকাছি কোনো সহনশীলতা খ্রিষ্টান ইউরোপে ইহুদিদের প্রতি, প্রোটেস্ট্যান্টদের জগতে ক্যাথলিকদের প্রতি কিংবা ক্যাথলিকদের জগতে প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রতি ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা অন্যের ধর্মবিশ্বাসে আদৌ হস্তক্ষেপ করেনি। কারণ, কুরআন শরিফ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে– লা ইকরাহা ফিদ্দীন– দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।

মধ্যযুগে ইনকুইজিশন বা শুদ্ধাভিযান করে ইউরোপ থেকে উগ্রবাদী খ্রিষ্টানরা যখন ইহুদিদের বিতাড়িত করল, তখন তারা এসে আশ্রয় পেয়েছিল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে। মুসলিম খলিফা ও সুলতানরা এসব বিতাড়িত ইহুদিদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শুধু মধ্যযুগ নয়; এই মাত্র গত শতাব্দীতে নাৎসি হলোকাস্টের মাধ্যমে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের ওপর চালায় নিপীড়ন-নির্যাতন। অথচ এই ইহুদিরাই আজ খ্রিষ্টান জগতের সাথে মিলেমিশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এভাবেই আজকের ইহুদিরা মুসলমানদের উপকারের প্রতিদান দিয়েছে। ইতিহাসের ধারা বড়োই অদ্ভুত!

সাম্রাজ্যবাদের বরকন্দাজ ওরিয়েন্টালিস্টরা একসময় প্রচার করেছিল, ইসলাম এক হাতে তরবারি আর অন্য হাতে কুরআন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। তরবারি দিয়ে দুয়েকজনকে হয়তো ধর্মান্তরিত করা সম্ভব, একটি সর্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়– যা নাকি পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষের বিশ্বাসের উৎস হয়ে আছে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সরল, অনাড়ম্বর, নিরাপস আদর্শ ও তার নবির অনুপম আত্মশুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীকতা এবং আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের জোরে। রসুল সা. তাঁর জীবদ্দশায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহনশীলতা ও সহাবস্থানের যে নজির স্থাপন করেছিলেন, তা এক কথায় তুলনা বিরহিত। তাঁর ঘোষিত ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ' একটি সহনশীল মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলকে রসুল সা. নিজে তাঁর মসজিদে প্রার্থনা করার অনুমতি দেন; পাশাপাশি তিনি নিজে একই গৃহভ্যন্তরে নামাজের ইমামতি করেন। রসুল সা.-এর ঔদার্যতায় একই মসজিদের অভ্যন্তরে একই সময় দুই পৃথক মতের অনুসারীরা তাদের আরাধনা সম্পন্ন করেন। এই সহনশীলতা ইসলামের নীতি। এই নীতি থেকে ইসলাম বিশ্বাসীরা কখনোই সরে আসেনি। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, সহনশীলতার পরিবেশ প্রথম বিঘ্নিত হয় ক্রুসেডের কালে। ক্রুসেডের হিংসার নদী পাড়ি না দিতেই আসে উপনিবেশবাদ– সাম্রাজ্যবাদের কাল। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-পীড়ন-নির্যাতনের ঐতিহ্য থেকে আজও পাশ্চাত্য বেরিয়ে আসতে পারেনি। হিংসার পূজা করে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করা কখনোই সম্ভব নয়।

সংস্কৃতির রূপান্তর

সংস্কৃতি বলতে আগে মানুষ ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিকেই বোঝাত। ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে মানুষ দেশে দেশে শিল্প সংস্কৃতির এক-একটা সাগর সঙ্গম সৃষ্টি করেছে। তাজমহল, মাইলো দ্বীপের ভেনাস, অজন্তার গুহা চিত্র, তানসেনের ধ্রুপদ সংগীত– এসব কিন্তু সবই ধর্মের প্রেরণাজাত। আর্টের জগতে যারা বাস করেন, তাদের চাই একধরনের অন্তরের প্রেরণা। সেই প্রেরণাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আসত ধর্ম থেকে।

প্রাচীনকালে মানুষ গুহাচিত্র আঁকত। দেখা গেছে– সেই সব গুহাচিত্রের মধ্যেও মানুষের বিচিত্র সব বিশ্বাসের ছাপ পড়ে আছে। মানুষ তার ধর্মবোধটাই গুহাচিত্রের বিচিত্র ভঙ্গিমার মধ্যে প্রকাশ করেছে।

পণ্ডিতেরা সভ্যতাকে শ্রেণিবিভাগ করেছেন বিভিন্নভাবে। তাদের মতে প্রাচীনতম হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা। তারপর ইজিপ্টের সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় সভ্যতা। তারপরে চীন। এসব সভ্যতা নানা দিক থেকে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। এখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। তারা গড়ে তুলেছিল স্থাপত্য, দুর্গ, পয়ঃপ্রণালী। এসব সভ্যতার লোকজন সংস্কৃতিমনস্কও ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সংগীতচর্চা, চিত্রচর্চা, নৃত্যচর্চা, নাট্যচর্চা, ভাস্কর্যচর্চাও করত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো– নানা রকম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, এসব সভ্যতার লোকজন কিন্তু ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনাও করত। মানুষের যুগান্তরের যেসব প্রশ্ন– যার উত্তর মানুষ চিরকালই খুঁজেছে, তার উত্তর এসব সভ্যতার লোকজন ধর্মের ভেতর দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করত। স্বর্গ-নরক, পাপ-পূণ্য, ঈশ্বর, পরলোক, অমরত্ব, নির্বাণ, স্যালভেশন, আত্মা-পরমাত্মা– এসব প্রশ্ন তাদেরও আচ্ছন্ন করেছিল। এসব সভ্যতার লোকজন কিন্তু মোটেই ধর্মহীন ছিল না; বরং বিচিত্র সব ধর্মবিশ্বাস তারা আঁকড়ে ধরেছিল।

এসব সভ্যতার ঘরে আলো জ্বালেন নবি, রসুল, মহাপুরুষগণ। এদের অনেকেই ছিলেন প্রত্যাদিষ্ট। এরা যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটান, তেমনি তাদের জাগতিক সমস্যা সমাধানের পথও বাতলে দেন।

হযরত ঈসা জন্মান ইহুদিদের ঘরে, কিন্তু তিনি সমস্ত মানুষকে আলো দিয়ে যান। তাঁর অনুসারীরাই গড়ে তোলে হলি রোমান এম্পায়ার। খ্রিষ্টধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপের সংস্কৃতিরও অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। স্থাপত্য হিসেবে গথিক ক্যাথেড্রালগুলো আজও অনন্য। দান্তে, বোকাচিও, মোজার্ট, বেঠোভেন, গ্যয়টে, চসার, মিল্টন, শেক্সপিয়র, এলিয়ট প্রমুখ একদিক দিয়ে চিন্তা করলে খ্রিষ্টধর্মের প্রেরণারই ফল।

হযরত ঈসার আগে শাক্য উপজাতির ঘরে জন্মান সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের সদ্ধর্ম তক্ষশীলা থেকে বিস্তৃত হয়ে যায় মধ্য এশিয়ায় এবং সেই পথ দিয়ে চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপানে। ধ্যানী বৌদ্ধ সাধকরা শুধু অহিংসার বাণী প্রচারই করেন না; তাদের মঠ ও বিহারগুলো ছিল শিল্প, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। নালন্দার কথাতো অনেকেই জানেন।

এরপরে মরুচারী আরবদের ঘরে জন্মান রসুল মোহাম্মদ সা.। তখনকার দিনে সভ্য জাতি হিসেবে আরবদের কোনো খ্যতি ছিল না। কিন্তু রসুলের শিক্ষার ফলে মাত্র একশ বছরের মধ্যে আরব বিশ্ব সভ্যতার চালকের আসনে আসীন হয়। দামেশক, বাগদাদ, ইস্পাহান, ইস্তাম্বুল, কর্ডোভা, কায়রো, দিল্লি, আগ্রা শুধু মুসলিম রাজ-রাজড়াদের নগর ও রাজধানী হিসেবে সমাদৃত হয়নি; জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, ললিত কলা বিকাশের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ধর্মের প্রেরণা না থাকলে তাজমহল, আলহামরা, মস্ক অফ কর্ডোভার মতো শিল্প সৃষ্টি হতে পারত না।

সব ধর্মের গোড়ার কথা হচ্ছে এক– Core of Morality। খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইসলাম– প্রত্যেকেই চায় মরালিটির শাসন, মরালিটির নিয়ন্ত্রণ। ধর্মের এই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় এক বড়ো রকমের ছেদ পড়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁর কালে। রেনেসাঁর মূল কথা হচ্ছে– মানুষও ইচ্ছা করলে সর্বশক্তিমান হতে পারে। তার মধ্যে আছে সর্বগুণের সম্ভাব্যতা। এর গুণে মানুষও পারে সর্বশক্তিমানের মতো নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করতে। রেনেসাঁর এই দর্শনের নাম– হিউম্যানিজম, যেখানে মানুষকে অপরিমেয় ভাবা হয়।

মনে রাখা দরকার– হিউম্যানিজম ও হিউম্যানিটি কিন্তু এককথা নয়। হিউম্যানিজম চায় মুক্তি। পারলৌকিকতা থেকে মুক্তি, পুরোহিতের হাত থেকে মুক্তি, রাজতন্ত্র থেকে মুক্তি, সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তি, ক্রীতদাসের মালিকের অধীনতা থেকে মুক্তি, কলামাত্রের কৃত্রিম বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি। এমনকি মরালিটি থেকেও মুক্তি। এককথায় সর্ববন্ধন মুক্তি। লিবার্টি। হিউম্যানিজম আরও চায় ইকুয়ালিটি। শ্রেণি নির্বিশেষে সাম্য। আর চায় মৈত্রী। ফ্রাটারনিটি। রেনেসাঁ এই ট্রিনিটির সাধনাই করেছে। সেই সাধনার চর্চা থেকেই আসে ফরাসি বিপ্লব।

রেনেসাঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে এই ট্রিনিটি। সেখান থেকে বাদ যায় মরালিটি। হিউম্যানিটি কিন্তু এই মরালিটি চর্চার ওপর জোর দেয়। ধর্মের ইচ্ছাও তাই। রেনেসাঁর জোর ট্রিনিটির ওপর, ধর্মের জোর মরালিটির ওপর। মরালিটি ছাড়া ট্রিনিটির বুনিয়াদ মজবুত হয় না। তার নজির আমরা ইতিহাসে পেয়েছি। ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবের আদর্শ ধরে রাখা যায়নি। বাস্তবে এ পৃথিবী থেকে আজও যুদ্ধ, বিদ্রোহ, সহিংসতা কোনোটাই নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। একজন মুসলিম সুফির কথা মনে পড়ছে, তিনি বলছেন :

বুদ্ধি বলতে থাকে– নিজেকে বাড়াও
প্রেম বলতে থাকে– তুমি নিজ স্বার্থ ত্যাগ করো।
(ফরিদউদ্দিন আত্তার)

ফরাসি বিপ্লবের পর হিউম্যানিজমের বিচিত্র শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয়। রোমানটিসিজম, আইডিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম, রিয়েলিজম, ইমপ্রেসনিজম, এক্সপ্রেসিনজম, সুররিয়ালিজম– সবই মানুষকে নিয়ে, প্রকৃতিকে নিয়ে। কোনোটিই ইন্দ্রিয়াতীতকে নিয়ে নয়। মানুষ ভাবতে থাকে– নিজেকে বাড়াতে বাড়াতে সে অতিমানবে পরিণত হবে। সে অতিমানবের অসাধ্য কিছু থাকবে না। নিটশের ভাষায় সুপারম্যান। সুপারম্যানের আয়ত্তে এসেছে অনেক কিছু। আয়ত্তাতীত রয়ে গেছে প্রেম, মরালিটি– যা ছাড়া প্রলয়কে, প্রতিহিংসাকে জয় করা যায় না। ইউরোপীয় রেনেসাঁ জগৎ সম্বন্ধে মানুষের অনেক ধারণা পালটে দিয়েছে। মানুষ জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেছে, তাকে নানা রকমভাবে ভাঙিয়ে নিয়েছে সে। মানুষকে করেছে শক্তিমান।

কিন্তু রেনেসাঁ মানুষের চরিত্র পালটাতে পারেনি। চোর-ডাকাতের হাতে বিদ্যুৎ, উড়োজাহাজ, পরমাণু বোমা গেলে তার পরিণতি বিপজ্জনক হবেই। মানবপ্রকৃতিকে সংশোধন না করে, বিশুদ্ধ না করে তার হাতে ক্ষমতা দিলে দানবিক কাণ্ড তো ঘটবেই।

নিজাম ডাকাত দরবেশে পরিণত হন, বাল্মিকী ঋষি হন ধর্মের প্রভাবেই। রেনেসাঁ কাউকে ঋষি করেছে, দরবেশ করেছে– এমন কথা শোনা যায়নি। উলটো রেনেসাঁর সন্তানদের হাতেই দু-দুটো মহাযুদ্ধের দানবিকতা আমরা দেখেছি। এখনও তাদের হাতে দেশে দেশে চলছে নরমেধযজ্ঞ, রক্তপাত, সহিংসতা। বোঝাই যাচ্ছে রেনেসাঁর মূল্য জ্ঞান যথেষ্ট নয়। নবি-রসুলদের জ্ঞানও অতি আবশ্যক। তাঁরাই সত্যিকারের প্রেমশীলতা, সত্যানুবর্তিতা ও অহিংসার আলো জ্বেলেছেন। তারাই এগুলোর আবাদ করে সোনা ফলিয়েছেন। ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা পাওয়া মানে মধ্যযুগীয় হওয়া নয়, প্রিমিটিভ হওয়াও নয়। মরালিটির জগতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ বলে কিছু নেই। মরালিটির মাত্রা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সমান। আর মধ্যযুগ, প্রাচীন যুগ মানেই সর্বনাশা কিছু নয়। হোমার, বাল্মিকী, কালিদাস, দান্তে, রুমি, ওমর খৈয়াম, শেক্সপিয়র কি এ যুগের মানুষ? প্রাচীন যুগের, মধ্যযুগের হয়েও এরা আধুনিককে ছাড়িয়ে গেছেন। এরা আধুনিকেরও আধুনিক, সর্বাধুনিক। এদের মতো প্রতিভা এ যুগে কয়টা জন্মেছে?

মুশকিল হচ্ছে বিজ্ঞানের কল্যাণে, আধুনিকের কল্যাণে এ যুগে আরেকটা তাজমহল হচ্ছে না। অজন্তা, আলটামিরার মতো গুহাচিত্র, প্রাচীন গ্রিসের নাটকের তুল্য কোনো কিছুই তৈরি হচ্ছে না।

তাহলে আধুনিককালই কি চূড়ান্ত? প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ থেকে আমরা কি কোনো প্রেরণা গ্রহণ করব না? একালের আন্তর্জাতিক সংঘাত, মহাযুদ্ধ, নাৎসি-ফাসিস্ট-জায়োনিস্ট-ইম্পেরিয়ালিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা এসব তো প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগের চেয়েও অন্ধকারাচ্ছন্ন কাণ্ড-কারখানা। একালের অন্ধকারকে ঢেকে রাখতেই কি আমরা আমাদের অতীতকে অস্বীকার করি?

আমাদের প্রয়োজন মডার্ন সভ্যতাকে মরাল সভ্যতা হিসেবে তৈরি করে নেওয়া। না হলে মডার্নের অপঘাতে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে। মডার্ন হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কারণ, আমাদের বাস্তব জ্ঞান দরকার, প্রকৃতির

ওপর প্রভাবকে বিস্তৃত করা দরকার। একই সাথে আমাদের মরাল হওয়াও দরকার। কারণ, মহাশক্তিমান হয়ে ইউরোপের মতো মানব-বিপর্যয়ের কারণ আমরা হতে চাই না। আমরা এমন একটা সম্পূর্ণতার, সৃষ্টিশীলতার স্বপ্ন দেখব– যেখানে আমরা পেছনে ফিরে যাব না ঠিক, কিন্তু পেছনকেও একেবারে অস্বীকার করব না। পেছনের প্রেরণাই আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পুরোপুরি আধুনিকতার হিংসা ও চোরাবালির ওপর আমাদের স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলতে দিতে পারি না। আমাদের ভবিষ্যতের সংস্কৃতি হবে একই সাথে মডার্ন ও মরাল। এককথায় মরালিটি হবে মডার্নিটির চালক।

একদিকে আমরা পেছনের সংস্কার-আবর্জনা সাফ করব, অন্যদিকে আমরা শক্তিমানদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাব। যারা মনে করে ব্যক্তিজীবনের বাইরে ধর্মের ও নৈতিকতার কোনো স্থান নেই, তারা কিন্তু সভ্যতার জন্য আরেকটা অপঘাত ডেকে আনার চেষ্টা করছেন। ব্যক্তির মতো সামাজিক জীবনেও একধরনের মরালিটি দরকার। না হলে সমাজের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়। তাই সামাজিক জীবনেও নীতিবোধ, ধর্মবোধ প্রতিষ্ঠা আজ জরুরি। তাহলেই আমাদের ভাবী সংস্কৃতি দুঃস্থতা কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

অনেকে বলেন, এ যুগ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের যুগ, জাতিরাষ্ট্রের যুগ। এর মোদ্দা কথা হচ্ছে– একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষী লোকজন কিংবা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ ধর্ম-নির্বিশেষে একই সংস্কৃতির সাধনা করবে এবং তারই ভিত্তিতে একটি জাতিত্বের ধারণা গড়ে তুলবে। রাষ্ট্র ব্যাপারে কিংবা রাজনীতি ব্যাপারে ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা সংগত হবে না। রাষ্ট্রের নাগরিক পরিচিত হবে রাষ্ট্র পরিচয়ে; ধর্ম পরিচয়ে নয়। রাষ্ট্রের কাজ হবে ধর্ম-নির্বিশেষে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা; ধর্মের বিভূতি বর্ধন করা নয়।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে– ধর্মের থেকে রাজনীতিকে পৃথক করা শক্ত, আর সংস্কৃতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। দেখা গেছে, ধর্ম কখনও কখনও ব্যক্তিমানস ও সমাজের খুব গভীরে পৌছে যায়, দেশে দেশে ধর্মই পুরো একটা সংস্কৃতির গতিপথ নির্মাণ করে এবং সেই সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়। আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাস এর বড়ো প্রমাণ। বহু ধর্মমত এ মাটিতে বিকশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সংখ্যার দিক দিয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই ভারতের মাটিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং ধর্মকে ভিত্তি করে একালে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের উত্থান ঘটে। এই জাতীয়তাবাদের চাপে একসময় ভারতই ভাগ হয়ে যায়। যারা একালে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বাড়-বাড়ন্তকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেন, তারা ভারতীয় উপমহাদেশের দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের এই ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য চেতনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ তো একদিনের ঘটনা নয়; এমনকি ব্রিটিশ ও জিন্নাহ সাহেবের রাজনীতির ফলাফলও নয়। হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ শুধু রাজনীতিঘটিত নয়;

সংস্কৃতিঘটিতও বটে। ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেসের নেতারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে ওপরে ওপরে একধরনের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত যৌথ জাতীয়তাবাদের কথা বলতেন। কিন্তু আদতে কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের কাজকর্মে দেখা গেল, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর এক সংস্কৃতিবাদ তথা হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লীগের তরফ থেকে এলো স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি।

ভারতের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ কখনোই ঘটেনি। ন্যাশনালিজম যে তত্ত্বটা, তা কোনোকালেই কোনো সম্প্রদায় গ্রহণ করেনি- না হিন্দু আমলে, না বৌদ্ধ আমলে, আর না মুসলিম আমলে। ন্যাশনালিজম বলতে এখানে বারবরই বুঝিয়েছে- হিন্দু ন্যাশনালিজম বা মুসলিম ন্যাশনালিজম। তার মানে- ধর্ম অনুসারে ন্যাশনালিটির চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের এখানকার কোনো কোনো পণ্ডিত ভারতের ইতিহাস ঘেটে একটি যৌগিক সংস্কৃতি ও সমন্বয় পন্থা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তার বাস্তব কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। আবার অনেকে আছেন ধর্মের বাইরে গিয়ে লোক সংস্কৃতিকে ভিত্তি করতে চান। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো- লোক সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে একটা জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে না। তাহলে তো লালন ফকিরের খোল-করতালেই আমাদের জাতীয়তাবাদঘটিত সমস্যার সমাধান ঘটত।

যে ইউরোপ থেকে আমরা সাংস্কৃতিক বহুত্ব (Cultural Pluralism) ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা পেয়েছি, সেখানেই কিন্তু বহুত্ববাদী চিন্তা-ভাবনা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও ধর্ম এক হওয়ার কারণে এক খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতি পুরো ইউরোপকে একধরনের সমজাতীয়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এতকাল ইউরোপে অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। এখন সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে এবং একটি মুসলিম সমাজ গড়ে উঠছে। এই ক্রমবর্ধমান মুসলিম সমাজের সাথে সেখানকার খ্রিষ্টানদের এখন ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে। যে সমাজে খ্রিষ্টানরা একচ্ছত্র, সেখানে মুসলমানরা তাদের আত্মপরিচয় বিকশিত করতে চাওয়ার কারণেই এই বিরোধের সূত্রপাত।

সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সে মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা সেখানকার খ্রিষ্টানদের অসহিষ্ণুতার নমুনা এবং বহুদিনের ইসলাম-বিদ্বেষের ফল বলে মনে হয়।

এতকাল বলা হয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের ওপর বৈষম্য সৃষ্টি করা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের ধারণার পরিপন্থি। অথচ সেই কাজটিই এখন করা হচ্ছে ফ্রান্সে, যেটি নাকি ধর্মনিরপেক্ষতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। এর থেকে স্পষ্ট হয়, শুধু ঘোষণা দিলেই একটা রাষ্ট্র সেক্যুলার হয়ে যায় না। অন্যদিকে ধর্মীয় আইডেন্টিটি যে সেক্যুলারিজমকে ছাড়িয়ে যায়, ফ্রান্সের খ্রিষ্টান-মুসলমান বর্তমান সম্পর্ক তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

বাংলাদেশের মতো দেশে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ কাজ করেনি। এর একটা কারণ হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সংখ্যাগুরু মুসলমানের সন্দেহ ও তাদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা। বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদে হিন্দু-মুসলমানের সমতা ও সমন্বয়ের কথা বলা হলেও ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও ঘটনা পরম্পরায় এই সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ অনেকখানি হিন্দুত্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দিয়েছে হিন্দু সমাজপতি ও বুদ্ধিজীবীরা। ফলে এই সংস্কৃতির যে পাটাতনটি তৈরি হয়েছে, তাতে হিন্দুত্বের প্রবণতাসমূহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও বাঙালি সংস্কৃতি বলতে এখানকার বাঙালিয়ানায় মুগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা সেই উনিশ শতকীয় কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তীয় প্রেক্ষিতটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। বাঙালি সংস্কৃতির এই অসংগত হিন্দুত্বমুখীনতার কারণেই এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হাল আমলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মধ্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। একটা জিনিস বোঝা দরকার, মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ কখনোই ইসলামকে অতিক্রম করে নয়। এই কারণেই কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ আজতক শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। ৫০ ও ৬০-এর দশকে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আরব জাতীয়তাবাদের ঢেউ লেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, নেতৃত্বের

বাগাড়ম্বর ও দুর্নীতি ছাড়া সেক্যুলারিস্টরা কিছুই দিতে পারেনি। ফলে সেখানে তারা আজ পিছু হটতে শুরু করেছে এবং সেই শূন্যস্থান ভরে ফেলেছে ইসলামপন্থিরা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মনে হয়েছিল তুরস্কের কামালিজম বোধ হয় সেখানে ইসলামের শেষ চিহ্ন রাখবে না। যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, সহিংসতা ও রক্তপাতের ভেতর দিয়ে কামালও চেষ্টা করেছিলেন ইসলামপন্থিদের উত্থান চিরতরে ঠেকিয়ে রাখতে। কিন্তু শতাব্দী শেষে দেখা গেল, কামালের হিসাব-কিতাব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রচণ্ড বৈরিতার মধ্যেও তুরস্কে আজ ইসলাম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস খুব মধুর নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এটি মুসলিম জনসাধারণের মতামতের বিরুদ্ধে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সর্বত্রই একধরনের সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা সকলের সহাবস্থানের কথা বললেও এটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এর পৃষ্ঠপোষকরা সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ধারণা ছুড়ে ফেলেছেন এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বের স্থলে একরৈখিক, মনোলিথিক (Monolithic) চিন্তার প্রশ্রয় দিয়েছেন। এটি সহাবস্থানের বদলে সংঘাতের অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সকল ধরনের ইসলামভিত্তিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার– একদিকে আমরা বলছি গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় সকলের কথা বলার অধিকার থাকবে, অন্যদিকে আমরা অন্যের রাজনীতিচর্চার ওপর খড়গহস্ত হব!

মুসলিম দেশগুলোতে সেক্যুলার জাতীয়তবাদের গোড়া শক্ত না হওয়ার কারণ এর অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর ধর্মবিরোধিতা। এ কারণেই মুসলমানরা সেক্যুলার জাতীয়তাবাদকে ধর্মহীনতার সাথে একার্থক হিসেবে দেখেছে এবং শেষমেষ প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রত্যাখ্যানের আরেকটা কারণ হচ্ছে– ধর্মনিরপেক্ষতা সর্বত্রই মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য চেতনাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। ইসলামের মৌলিক প্রবণতাগুলোকে বাদ দিয়ে ইসলামপূর্ব স্থানিক সংস্কৃতির মধ্যে সেক্যুলারিস্টরা আত্মপরিচয় খোঁজায় বেশি আগ্রহী।

ইসলাম স্থানিক সংস্কৃতির সাথে একধরনের সহাবস্থানে বিশ্বাসী। প্রয়োজনে ইসলামের মৌলিক প্রবণতার বিপরীতার্থক না হলে এর সদর্থক উপাদানগুলো গ্রহণ করতে রাজি। কিন্তু ঢালাওভাবে ইসলামের সাথে সমন্বয়ের নামে জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি চর্চার পক্ষপাতী নয়। এ ধরনের সমন্বয়বাদিতার কারণে ইসলামের মৌলিক প্রবণতাগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনাকে তাই ইসলাম তার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। আগেই বলেছি হিন্দুত্বনির্ভর বাঙালি সংস্কৃতি এখানকার বাংলাভাষী মুসলমানকে এক সংস্কৃতিহীনতার দিকে টানছে। এর সাথে তাই ইসলামের সমন্বয় সম্ভব নয়।

বাঙালি সংস্কৃতি যদি হয় সকল বাংলাভাষাভাষীর সংস্কৃতি, তাহলে সেখানে বাঙালি মুসলমানের জীবন-ভাবনার প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। কেননা, সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই অগ্রগণ্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রেক্ষিত ভেঙে ফেলে বাঙালি মুসলমানকে বাঙালিত্বের নতুন একটা প্রেক্ষিত তৈরি করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে বাঙালিত্বের নতুন একটা সংজ্ঞা নির্মাণ করা এখন সময়ের দাবি, ইসলাম হবে যার মেনস্ট্রিম ফিলসফি। ইতিহাস বাঙালি মুসলমানের ওপর বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রস্তাবিত নতুন সংস্কৃতির পটভূমি ইসলামের বৈশ্বিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্প্রসারিত হবে এবং উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপট ছুড়ে ফেলে নতুন যুগের মুখোমুখি হওয়ার সাধনা করবে।

সংস্কৃতির সীমানা

সংস্কৃতির জগতে নান্দনিকতা ও অশ্লীলতার সীমানা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। কাকে বলব নান্দনিকতা, আর কাকে বলব অশ্লীলতা এই বিতর্কের ফয়সালা আজও সাহিত্যরসিকরা পুরোপুরি করতে পারেননি। এর কারণ হচ্ছে– রসিকজনেরা এই মামলার মীমাংসা করতে চান তাদের নিজের নিজের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান থেকে। যার ফলে কোনো ফয়সালাই শেষ পর্যন্ত মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হতে পারেনি।

ব্রিটেনে একটা সময় ডি.এইচ. লরেন্সের *'লেডি চ্যাটারলিজ লাভার'* বইটিকে অশ্লীল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। একটা পর্যায়ে বইটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখন আর বইটি বেআইনি নয়। বইটি পেয়েছে প্রথম শ্রেণির উপন্যাসের স্বীকৃতি। নান্দনিকতা ও শ্লীলতা, সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি– এর যে মানদণ্ড, এটি কিন্তু নির্ভর করে আমাদের মূল্যবোধ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

সেভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর দস্তয়েভস্কির উপন্যাসকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল। কমিউনিস্টরা যুক্তি দিয়েছিল তার উপন্যাস সমাজ-প্রগতির জন্য বড়ো রকমের বাধা। তেমনি করে বরিস পাস্তারনাক ও আলেক্সান্ডার সোলঝেনিৎসিনের উপন্যাসের ওপরও তারা অনেক কড়াকড়ি আরোপ করেছিল। কমিউনিস্টরা গোর্কি, মায়াকোভস্কি ও শলোকভের লেখালিখি যেমন করে বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছে, টলস্টয় কিংবা তুর্গেনিভের লেখা নিয়ে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

এই কমিউনিজমের যখন পতন ঘটল, তখন কিন্তু একই রাশিয়ায় শোনা গেল ভিন্ন কথা। রাশিয়ার লোকজন অন্য রকম এক মতামত প্রচার করতে শুরু করল। তারা বলতে লাগল, কমিউনিস্টরা রুশ শিল্প-সাহিত্যের যে

অপূরণীয় ক্ষতি করে গেছে, তার তুলনা একেবারে নেই। তাদের সংস্কৃতি চেতনা ছিল অপসংস্কৃতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কমিউনিস্টরা মানবমুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রতিষ্ঠা করার নামে যত অপকর্ম করেছে, তা আর কেউ করতে পারেনি। তারা শ্রেণি-সংগ্রামের কথা বলে একধরনের বিদ্বেষ প্রচার করেছে এবং একদেশদর্শী মতান্ধ মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

কমিউনিস্টরা যে মতান্ধ, তার কারণ হচ্ছে- তাদের গুরু মার্কসের ইতিহাসভাষ্য। ইতিহাসে কী ঘটেছে তার সত্যিকার যাচাই-বাছাই না করে শ্রেণি স্বার্থ ও অর্থনীতির ভাষ্য দিয়ে একটা পূর্ব নির্ধারিত ছকে তারা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। ৫০ ও ৬০-এর দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়ে আমাদের দেশে এবং এখানকার কিছু বুদ্ধিমান তরুণ মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। এই মতান্ধ মার্কসবাদীরা শ্রেণি-সংগ্রাম দিয়ে ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রচার করেন, ইসলাম হচ্ছে শোষক শ্রেণির ধর্ম এবং এই ধর্ম যাবতীয় সমাজ প্রগতির অন্তরায়।

কমিউনিস্টরা এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যমুখী আন্দোলন ও কার্যকলাপকেও সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে চিহ্নিত করে; অথচ এরা কখনও হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনকে একইভাবে আক্রমণ করে না। কমিউনিস্টদের এই দ্বিমুখী আচরণ কার্যত একধরনের ইসলামবিরোধী সাম্প্রদায়িক চেতনার ফল। কমিউনিজমের পতনের পরও বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র সমাজবাদী গোষ্ঠী চিন্তা-চেতনা লেখালিখিতে নিস্তেজ হয়ে যায়নি। এখনও তারা ইসলামবিদ্বেষ সমানে ছড়িয়ে চলেছে। ইসলামবিরোধী এইসব কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সাথে এখন যুক্ত হয়েছেন একদল সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী। এসব সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা প্রায় একচ্ছত্রভাবে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও মিডিয়ার জগৎ দখল করে বসে আছেন এবং অনবরত প্রচার করে চলেছেন ইসলাম আর সংস্কৃতি একসাথে চলতে পারে না। এদের আমূল ইসলামবিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এরা প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করতে রাজি, কিন্তু ইসলামকে ঘায়েল করা চাই। তাদের এই অসংগত ইসলামবিরোধিতার মূলে আছে ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিপুল অজ্ঞতা ও পাশ্চাত্যের বৈরী প্রচারণা।

ইসলামের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের শক্তি আগেও ছিল এবং এখনও আছে। এই শক্তি না থাকলে ইসলামে বিশ্বাসীরা মানুষের ইতিহাসে এত বড়ো সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারত না। মুসলিম সভ্যতার গোড়ায় যে এক নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণা কাজ করেছিল এসব কথা ঐতিহাসিকরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ইসলামবিরোধিতার সুরটা এসেছে ইউরোপের রেনেসাঁ উদ্ভূত চিন্তা-ভাবনা থেকে। কিন্তু একটা জিনিস বোঝা দরকার– ইউরোপের ইতিহাসে খ্রিষ্টান ধর্মের বিবর্তন যেভাবে হয়েছে, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ইসলামের বিবর্তন সেরকম হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে রেনেসাঁর প্রয়োজন হয়নি। আবার রেনেসাঁর পেছনে যেরকম চার্চ ও পাদরিদের অত্যাচারের ইতিহাস আছে, ইনকুইজিসনের ঘটনা আছে, ডার্ক এজের কথা আছে– ইসলামের ইতিহাসে তার নজির নেই। তাই ইসলামকে বিবেচনা করতে হবে ইসলামের ধারায়। ইসলামকে ইউরোপীয় আয়নায় বিচার করতে গেলে ইসলাম বিশ্বাসীদের প্রতি একধরনের অবিচার করা হবে।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূলকথা হচ্ছে– ইহজাগতিকতা। মানে এই সংস্কৃতির মূল পরিমণ্ডল হচ্ছে জাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইসলাম হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়; মৃত্যুর পরেও একটি জীবন আছে এবং সেই জীবনে জবাবদিহি করতে হবে। এই বিশিষ্ট চিন্তা ইসলাম বিশ্বাসীদের একটি নৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে সাহায্য করে। তাই ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে নৈতিকতাভিত্তিক এবং মানবতামুখী। তাই 'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটা ইউরোপীয় ইহজাগতিকতার ফ্রেমে বন্দি করা গেলেও ইসলামি নীতির আলোকে পুরোপুরি ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। ইসলামের সাথে বরং 'মানুষের জন্য শিল্প' কথাটা বেশি মানানসই। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মারমাডিউক পিকথল ইসলামি সংস্কৃতির একটা জুতসই সংজ্ঞা দিয়েছেন, উদ্ধৃত করছি :

> By Islamic culture, I mean not the culture, from whatever source derived, attained at any given moment by people who profess the religion of Islam, but the kind of culture prescribed by a religion of which human progress is the definite and avowed aim.[১]

---

১. Muhammad Marmaduke Pickthall, *The Cultural side of Islam*. New Delhi: Kitav Bhavan, 1990.

এর মানে হচ্ছে– শিল্প সংস্কৃতি, স্থাপত্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত বড়ো অর্জনই আমরা করি না কেন, তা যদি ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়ক না হয়, তবে তাকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যাবে না। তাহলে একদিক থেকে বলা যায়– সমাজ থেকে যদি বেইনসাফি, অসহিষ্ণুতা, ভোগবাদী ক্ষয়িষ্ণুতা প্রভৃতি প্রবণতাগুলোকে হটানো না যায়, সমাজের ভেতর যদি তৌহিদের নীতিকে প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তবে শুধু কলাচর্চা করে ইসলামের সংস্কৃতির নীতি বাস্তবায়ন করা যাবে না। এই নীতি কার্যকর করতে হলে চাই কুরআনের মৌলিক নিয়ম-কানুনকে বাস্তব অর্থে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে আভাসিত করে তোলা। এই কার্যকর করার যাত্রাপথে সংস্কৃতি ও কলাচর্চা হচ্ছে একটা মাধ্যম। তাই ইসলামি নীতিতে মাধ্যম কখনও লক্ষ্যের স্থান দখল করে নিতে পারে না।

মারমাডিউক পিকথল তাঁর বিখ্যাত *Cultural Side of Islam* গ্রন্থে পাশ্চাত্যের ইহজাগতিক সংস্কৃতির সাথে ইসলামি সংস্কৃতির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে সেখানকার পত্র-পত্রিকায় বহুল প্রচারিত একটা বিতর্কের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রশ্নটা হলো– একটি ঘরে তুলনাহীন ও অপরিবর্তনযোগ্য একটি প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর্যের সাথে একটি মানবশিশু অবস্থান করছে এবং হঠাৎ করে ঘরটিতে আগুন ধরে গেছে। এ পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র দুটির একটি রক্ষা করা সম্ভব, কোনটি রক্ষা করা উচিত? পিকথল লিখেছেন সেদিন পাশ্চ্যাত্যের বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞজনেরা ভাস্কর্যটি রক্ষার জন্য জোর দেন। তাদের অদ্ভুত যুক্তি ছিল– এই পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রিক স্থাপত্য একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এই ধরনের চিন্তার কথা কোনো মুসলমানের মাথায় আসতেই পারে না। এটি হচ্ছে মূর্তিপূজার আধুনিক সংস্কৃত রূপ। একজন মুসলিম মানুষের সৃষ্ট কোনো কলাশৈলী– তা সে যতই নান্দনিক তাৎপর্যপূর্ণ হোক না কেন– তাতে সে কখনও দেবত্ব আরোপ করতে পারে না। এটি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ও মানবজাতির প্রতি তার মহান উদ্দেশ্য অস্বীকৃতির নামান্তর। গ্রিক ভাস্কর্য রক্ষার ইচ্ছা একধরনের নৈরাশ্য লালন করার ফল। কিন্তু ইসলাম নৈরাশ্যের কথা বলে না; বলে প্রত্যয়ের কথা। এ কারণে ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিব, সেক্যুলার ও ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে কোনো রকমের ভেদরেখা টানা হয়নি। ইসলাম মানুষকে একটি অবিভাজ্য সামগ্রিক

সত্তা হিসেবে দেখে। এ কারণে ইসলামে একই সাথে কুরআন চর্চার কথা বলা হয়েছে। কুরআনে পার্থক্যটা করা হয়েছে ভালো ও মন্দের ধারণা থেকে। এই ভালো ও মন্দের মানদণ্ডটা নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষের জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর সেই হিসেবে।

ইসলামের মধ্যে এসব প্রগতিশীল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের আধুনিকতাবাদীদের কথা একটাই– ইসলাম এ যুগে অচল। কেননা, এটি মধ্যযুগীয় ধর্মচিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানকালের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সিভিল সোসাইটি, জেন্ডার ইস্যুর মতো ব্যাপারগুলো ঠিক ইসলামের সাথে খাপ খায় না। একালে ইসলামের প্রবক্তারা এসব কথার সাথে একমত হতে পারছেন না। যেমন, ইকবাল ইসলামকে বলেছেন Theocratic Democracy –ধর্মীয় গণতন্ত্র। এ গণতন্ত্র ঠিক দূরবর্তী কোনো ধর্মতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় যে, শুধু প্রার্থনার সময় এর প্রয়োজন পড়বে এবং বাকি সময় এটি বিস্মৃত থাকলেই চলবে। পক্ষান্তরে এটি হচ্ছে একটি বাস্তবসম্মত, কার্যক্ষম ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা ও গণতন্ত্র– যা সার্বক্ষণিকভাবে পালন করা চাই। জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র এর প্রতিফলন থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার, ইসলামকে অন্যান্য অনেক তামাদি হয়ে যাওয়া ধর্মের সাথে তুলনা করলে চলবে না। কারণ, ইসলামে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির একটা রূপরেখা আছে– যা অন্য ধর্মে নেই। এর ওপর ভিত্তি করে একালের ইসলামপন্থিরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের একটা বিকল্প পথ আমাদের দেখাচ্ছেন। তারা এটাও বলতে চাইছেন, পশ্চিমি আধুনিকতার বাইরেও ইসলামের নিজের মতো করে আধুনিকতা রূপায়নের একটি বিকল্প শক্তি আছে। সুতরাং ইসলামি সমাজ কোনো বদ্ধজলা নয়। ধর্ম নিয়ে যে আধুনিকতার চর্চা করা যায়, তা একালের ইসলামপন্থিরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। ইজতিহাদের প্রক্রিয়াগুলো আবার সচল হয়ে উঠেছে। ইজতিহাদ হলো সময়োপযোগী পরিবর্তনের জন্য যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহারের নির্দেশ। আমাদের পাশ্চাত্য অনুগত আধুনিকতাবাদীরা ইসলামের ভেতরের এই পরিবর্তনগুলো গভীরভাবে বুঝে দেখলে তাদের অনেক ভ্রান্তির অবসান ঘটবে।

সংস্কৃতির অবক্ষয়

আমাদের সংস্কৃতিতে রুচির যত প্রসার ঘটছে, সেই রুচির স্থূলীকরণ ও কদর্যকরণও যেন ঘটছে একই তালে। এক হিসেবে বলা যায়- এই রুচির স্থূলীকরণ আমাদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সংকটের নমুনা।

গত পঞ্চাশ কী ষাট বছরে আমাদের সমাজে বিপুল পরিবর্তন এসেছে- যা নজর এড়ানোর নয়। সামাজিক মানুষের মধ্যে নানা রকম সমৃদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটেছে, নগরায়ণ হয়েছে, শিল্পায়ন হয়েছে। সুউচ্চ সৌধশ্রেণি, সুসজ্জিত বিপনী নগরীর চেহারাই পালটে দিয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বেড়েছে, তেমনি সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সরব উপস্থিতিও দেখার মতো, বিশেষ করে নারী শিক্ষার অগ্রগতি একালের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। দৈনিক ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি পুস্তক প্রকাশনা ও পাঠকের সংখ্যাও একইভাবে বেড়ে চলেছে। চিত্র প্রদর্শনী, সাহিত্য সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সিনেমা, নাটক, নৃত্যানুষ্ঠানও পরিমাণগতভাবে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি দৃষ্টিগোচর।

আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক চলমানতার এ হচ্ছে বাইরের ছবি। কিন্তু এই চলমানতা যতখানি পরিমাণগত, ঠিক ততখানি গুণগত নয়। এই শ্রীবৃদ্ধি উৎকর্ষতার দিক দিয়ে, মননগত বিচারে কতটুকু জনকল্যাণমুখী- তাও প্রশ্নসাপেক্ষ।

আমাদের সংস্কৃতি জগতের এখনকার একটা দুর্লক্ষণ হচ্ছে- সেসব গ্রন্থ, সাময়িকী, নাটক কিংবা সিনেমা প্রচুর পারিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে- যা কিনা তুলনামূলকভাবে তরল রসের পরিবেশন করছে। রুচির স্থূলীকরণ সম্ভব হয়েছে বলেই দর্শকসমাজে ও পাঠকসমাজে এই তরল রসের পরিবেশকেরই গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। কয়েক দশক আগেও প্রকাশিত

পুস্তক-পুস্তিকার সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়, এখনকার প্রকাশনাগুলোতে মননশীলতা ও গভীর জীবনবোধের অভাব কতখানি ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, সিনেমা ব্যবসায়ী ও পুস্তক প্রকাশকরা আমাদের জনমানসের এই প্রবণতাগুলো সম্বন্ধে সচেতন এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে তারা এতটুকু কার্পণ্য করেন না। সচেতনভাবেই যেন তারা রুচির স্থূলীকরণের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই অবস্থার জন্য দায়ী শিল্প-সাহিত্যের ব্যবসায়ীকরণ এবং পুস্তক প্রকাশক ও সিনেমা ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য শিল্প সংস্কৃতির সেবা নয়; বরং মুনাফা ও দ্রুত অর্থোপার্জন। দ্রুত মুনাফা অর্জনের নেশায় তারা এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছেন যে, শিল্প-সংস্কৃতির কোনো মূল্যবোধ তারা মানতে রাজি নন। মননশীল ও গভীর জীবনবোধ আশ্রয়ী পুস্তক-সাময়িকী প্রকাশে তাদের অনীহা সুস্পষ্ট। অথচ সেসব প্রকাশনায় তারা বিনিয়োগ করতে উৎসুক– যা সমাজের জন্য আশু ক্ষতিকর ও উত্তেজক, অথচ বিনিয়োগের অর্থ দ্রুত উঠে আসার সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত।

সংস্কৃতির জগতের আরেকটা সংকট একই সাথে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা হলো– সত্যিকার সৃষ্টিশীল প্রতিভার সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সংস্কৃতির জগৎ এখন ভারী করে রেখেছে সৃষ্টিহীন, প্রতিভাহীন কতকগুলো বর্ণচোরা লোক, যারা রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের মতো এই জগৎকেও দলাদলি ও কাদা ছুড়াছুড়ির একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত করেছে। প্রতিভার কাজ হচ্ছে– সৃষ্টিশীল মতবাদ, গভীর জীবনজিজ্ঞাসা ও সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিচয় দেওয়া– যা কিনা জাতির ভাবাদর্শের নেতৃত্ব দেবে এবং সংকটে জাতিকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে। আমাদের দুর্ভাগ্য– এই রকম প্রতিশ্রুতি নিয়ে কোনো নতুন প্রতিভার আবির্ভাব তেমন একটা হচ্ছে না।

তাই আমাদের সংস্কৃতি-রুচির স্থূলীকরণও আজ একপক্ষীয় ব্যাপার নয়। প্রতিভার সংকট হেতু মেধাহীন লোকেরা সংস্কৃতির জগৎ দখল করে যেমন একদিকে তরল ও উত্তেজক প্রমোদরসের জোগান দিচ্ছে, তেমনি পুস্তক ও সিনেমা ব্যবসায়ীরাও পূর্ণ উদ্যমের সাথে সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে একটি আরেকটিকে উজ্জীবিত করছে এবং এ দুইটি এখন আমাদের সমাজের বাস্তব ছবি হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির জগতের এই গভীর

সংকটের কারণ হয়তো বহুবিধ, তবে সাম্প্রতিক দুয়েকটি সামাজিক লক্ষণ এর সাথে গভীরভাবে জড়িত বলে মনে হয়। গত কয়েক দশক ধরে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নানা রকম টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে চলা সত্ত্বেও সামাজের ভেতর একধরনের পরার্থপরতা ও মানবিকতার মূল্যবোধ সচল ছিল বলা যায়। এই মূল্যবোধ আমরা পেয়েছি ইসলাম থেকে এবং এটিকেই যুগ যুগ ধরে আমরা লালন করে এসেছি। কিন্তু বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্রের পরাজয়, পুঁজিবাদের জয়জয়কার এবং বিশ্বায়নের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উত্থানের ফলে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং পুঁজিবাদের আবশ্যিক সঙ্গী শোষণ, পীড়ন, বৈষম্য, দুর্নীতি এখন আমাদের দুয়ারে অব্যাহতভাবে হানা দিতে শুরু করেছে।

একই সাথে আমাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে সমানতালে। অতীতের তুলনায় আমাদের জীবনযাত্রায় কিছুটা সমৃদ্ধি এসেছে ঠিক, কিন্তু সেই সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমরা এখন সব রকমের নৈতিকতা, শোভনতা ও মূল্যবোধকেও পদদলিত করতে রাজি। যেকোনো মূল্যে বিত্তশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তি যেকোনো ধরনের নৈতিকতাবিরোধী কাজকর্ম করতেও আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। চোরাচালানী, কালোবাজারী, উৎকোচের মতো পদ্ধতিগুলো এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে এসব আগে সমাজে ঘৃণিত হতো। ঘুষখোর কিংবা মদখোরকে গ্রামের লোক মিলে বিচ্ছিন্ন বা একঘরে করে রাখতেও দেখা গেছে। তার মানে এগুলোর পেছনে সমাজের কোনো অনুমোদন ছিল না এবং এসব প্রবণতার বিরুদ্ধে সমাজই একটি প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করত। নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সমাজের এই প্রাকৃত বন্ধনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে এই ঘৃণিত পদ্ধতিগুলো আর অবাঞ্ছিত ঠেকছে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত হয়েছে; বরং এই ঘৃণিত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করে কেউ যদি বৈষয়িকভাবে সফল হয়, তবে তাকে আর এখন ঘৃণা করা হচ্ছে না। তাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধিমান। অন্যদিকে নৈতিক অনুশাসন মেনে চলে কেউ যদি যথেষ্ট লেখাপড়া করেও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়, তবে তাকে বলা হচ্ছে বোকা। নৈতিকভাবে সবল হলেও সামাজিকভাবে সে হয়ে যায় উপেক্ষণীয়, অনাদর ও অবহেলার শিকার। বৈবাহিক সম্বন্ধের বেলায় আগে যেখানে

পাত্রের উঁচু নৈতিক চরিত্রকে একটা বড়ো গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, এখন সেখানে গুণ হিসেবে দেখা হচ্ছে পাত্রের বৈষয়িক সফলতা কতটুকু। পয়সাওয়ালা না হলে শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের খাতির নেই। তার মানে- আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা আকারে-ইঙ্গিতে যেন এটাই বলে দিতে চাইছে- যদি সমাজে মর্যাদাবান হতে চাও, তাহলে পয়সাওয়ালা হও। পয়সা অর্জনের পদ্ধতি এখন দেখার বিষয় নয়; বিষয় হচ্ছে তুমি পয়সার মালিক কিনা।

এই যে নীতিহীন বিত্তপূজা এখন আমাদের সমাজে কায়েম হয়েছে, এর ফলে গুণীর কদর কমে যাচ্ছে। গুণী ব্যক্তির অভাবে সমাজের চিরকালীন মূল্যবোধগুলো একপ্রকার ভেঙেচুরে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কারণ, তারাই এসব মূল্যবোধগুলো টিকিয়ে রাখতে ও যুগপৎ চর্চা করতে প্রধান ভূমিকা রাখেন। কিন্তু আজকাল যেহেতু বিত্তের মানদণ্ডে সমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়, তাই নৈতিক মানদণ্ড সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং চতুর্দিকে এক নীতিহীনতার মচ্ছব শুরু হয়েছে। এই নীতিহীনতার সংক্রমণ প্রথম সমাজের উঁচুতলায় ধাক্কা দিয়েছে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই প্রথম নৈতিকতাকে ছুড়ে ফেলেছেন এবং যেকোনো প্রকারেই হোক সমাজের কর্তৃত্বকে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছেন। এর প্রভাব সমাজের সব শ্রেণিতে আছড়ে পড়েছে।

সমাজের যারা নীচু স্তরে পড়ে আছে, তারা ভাবছে- সমাজের কর্তাব্যক্তিদেরই যখন নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই, তখন আমরা খামাখা নৈতিকতার পিছনে দৌড়াতে গিয়ে জীবন সংগ্রামে ব্যর্থতা বরণ করব কোন দুঃখে। এখন নির্মম হলেও সত্য, সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক- জীবনযাত্রার একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছানোর জন্য আমরা একটা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে গেছি। যেকোনো মূল্যে হোক, তা সে যত ঘৃণিত পদ্ধতি হোক, বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনই হচ্ছে এখন আমাদের মোক্ষ। বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন কোনো অন্যায় ব্যাপার নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য নৈতিক অর্থে আগে যে ধর্ম ও অধর্মের বিভাজনটা ছিল- এখন তা প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। তাই কালোবাজারী, ফটকাবাজি, ঘুষ গ্রহণের মতো পদ্ধতি অবলম্বন করেও একালে আমাদের 'ভদ্র' ও 'কালচার্ড' হতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

এই অধপতিত ও কলুষিত মূল্যবোধ থেকে এখন আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের জগতের মানুষগুলোও আত্মরক্ষা করতে পারছেন না। যে জগতের মানুষগুলোকে আমরা সাধারণত মননশীল ও সৃজনশীল বলে মনে করে থাকি, যাদের সম্বন্ধে মনে করা হয় বৈষয়িক ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন বা নিরপেক্ষ এবং যাদেরকে নিয়ে সমাজের মননচর্চার কথা ভাবা হয়, তারাই আজ যেন বিকৃত চিন্তা-ভাবনার উপাসক হয়ে উঠেছেন। যেকোনো উপায়ে পয়সাওয়ালা হওয়া ও আখের গোছানোর চেষ্টা করা এবং সেই আকাঙ্ক্ষায় নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন, আদর্শ পরিবর্তন, পরস্পরের স্বার্থে পরস্পরকে পৃষ্ঠপোষণ, অন্ধ দলবাজি এখন কোনো দুর্লভ ব্যাপার নয়। এই কারণেই শিল্প-সাহিত্যের জগতে মৌলিক ও শিল্প মানসমৃদ্ধ কোনো লেখার বা সৃষ্টির দর্শন মিলছে না। উত্তম ও মৌলিক কিছু নির্মাণ বা সৃষ্টি করতে হলে যে সাধনা ও একাগ্রতা দরকার, যে ব্যাপক পঠন-পাঠনের প্রস্তুতি থাকা দরকার, তা হারিয়ে যেতে বসেছে। অন্যদিকে মননধর্মী লেখার জন্য যে ধরনের পরিশ্রম দরকার, সেই পরিশ্রমের যথাযথ ফল ও স্বীকৃতি লেখক যদি না পান, তাহলে তিনি নিরুৎসাহিত হবেন। তিনি যদি দেখেন, মাত্র কয়েকদিনের হালকা পরিশ্রম করে যে অর্থাগম হয় বা স্বীকৃতি মেলে আর বহুদিন অধ্যবসায়ের ফলে লিখিত কোনো মননধর্মী ও জীবনধর্মী লেখার ক্ষেত্রে একই রকম অর্থাগম হয় বা স্বীকৃতি মেলে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটুকুও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না, তাহলে কে আর মননধর্মী লেখা লিখতে উৎসাহী হবে! আগেই বলেছি, প্রকাশকরাও মননধর্মী লেখা প্রকাশে আদৌ উৎসাহিত নন। যে সমাজে শ্রম ও সাধনার মূল্য নেই, সেখানে সাধকরাও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যান কিংবা ধীরে ধীরে তাদের প্রতিভাকেও ব্যবহার করেন স্থূল জৈবিক চাহিদা মেটানোর সহায়ক শক্তি হিসেবে।

আমাদের সমাজে এখন যে নীতি-নৈতিকতাহীন ও রুচিহীন বিত্ত পদ্ধতির প্রসার ঘটেছে, তার ফল হয়তো কেউ কেউ ভোগ করছেন। কিন্তু একটা জিনিস বোঝা দরকার– এই ফল তারা ভোগ করছেন অন্য কাউকে ফল বঞ্চিত করে। সমাজে যদি এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ওপরে উঠার জন্য বা বিত্তশালী হওয়ার জন্য যেকোনো পদ্ধতি সিদ্ধ– তাতে একজনকে বঞ্চিত করেই অন্যজনের পথ সুগম হবে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে পায়ে দলে যে সমৃদ্ধি আসে, তাতে যে জটিল চক্রের সৃষ্টি হয় সেই চক্রে পড়ে মানুষের

নিগ্রহ ও নিষ্পেষণই বাড়ে। এক নীতিহীনতা আরেক নীতিহীনতার পথ উসকে দেয়। যিনি আজ নীতিহীনতার পথে সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন, তিনি যদি নিজেকে মনে করেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তবে এর চেয়ে বড়ো বিভ্রম আর নেই। কারণ, কোনো সমাজই প্রতিদ্বন্দ্বী বিরহিত নয়। অন্য একটা নীতিহীনতার ঝড়ে তার অবলীলায় ভেসে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। 'খুনি খুনির হাতেই শেষ হয়ে যায়'– এ ধরনের প্রবচন আমাদের সমাজের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফল থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতিহীনতা, রাজনৈতিক গোলযোগ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা, যৌনবিলাস, সাংস্কৃতিক অধোগতি ও অন্যান্য দুর্লক্ষণগুলো দীর্ঘদিনের ব্যক্তিক ও সামাজিক নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। ফলস্বরূপ যুগ-যুগান্তরের সামাজিক কাঠামোটিই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং সমাজ থেকে ইনসাফ প্রায় উঠে গেছে। এরই ফলে তৈরি হয়েছে সমাজের শ্রেণিতে-শ্রেণিতে বৈষম্য। একজনের হাতে সমৃদ্ধি উপচে পড়ছে, আরেকজন সেই সমৃদ্ধির ছিটেফোটা পাওয়ার জন্য রক্ত পানি করে ফেলছে। আজকে দেশজোড়া যে উগ্রবাদী সন্ত্রাস চলছে, তার উৎস এই বৈষম্যের জমিনেই খুঁজতে হবে। কারণ, বৈষম্যের জমিনই সন্ত্রাসের উর্বরা ক্ষেত্র।

নীতিহীনতা আজ সমৃদ্ধশালী ও সমৃদ্ধিহীন উভয়ের ধর্মে পরিণত হয়েছে। সমাজে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার হাত থেকে ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিত কেউ-ই রেহাই পায় না।

আমাদের নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের সময় থাকতে হুঁশ হওয়া দরকার। সমাজে এখন জরুরি ভিত্তিতে ইনসাফ ফিরিয়ে আনা দরকার। বৈষম্যহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন। নিজেদের আত্মস্বার্থপর চিন্তা-ভাবনা ও সংকীর্ণ দলাদলি ত্যাগ করে যদি তারা এদিকে মনোযোগ না দেন, তাহলে কেউ-ই এই বিশৃংখলার আগুন থেকে রেহাই পাবে না।

সংস্কৃতির সংকট

এক.

বহুকাল ধরে মুসলমান সমাজকে এক হীনম্মন্যতার রাহু কুরে কুরে খাচ্ছে। মুসলমান সমাজের মধ্যে এই যে এইভাবে একটা সংকীর্ণতার ভাব আর নানামুখী দারিদ্রের লক্ষণ উঁকি দিচ্ছে তা যেমন একদিকে করুণ, অন্যদিকে আমাদের পরাজয়ী মনোভাবের ইঙ্গিতবহ। বেশ কিছু সময় ধরে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আর টেকনোলজির জগৎ থেকে পিছিয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও কর্মশীলতার উত্তাপ নিভে গেছে বললেই চলে। এ কালে মুসলমানরা জগৎসভায় খুব বড়ো কিছু Contribute করতে পারছে বলে মনে হয় না। এ বাস্তবতা আমাদের জন্য মেনে নেওয়া কঠিন হলেও সেটি অত্যন্ত তীব্রভাবে সত্য।

অথচ বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে অগ্রসর ছিলেন এবং আমাদের এই উপমহাদেশেই ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগীজ যেসব পরিব্রাজক সে সময় এসেছে, তারা মুসলমানদের অর্জন দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছে। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা- যে সমাজ নতুন কোনো চিন্তাধারা উপস্থিত করতে পারে না, সময়ের হিসাবে সেটা Backward হয়ে যায়। এই Backwardness বা পশ্চাৎবর্তিতা ঠেকাতে তাই প্রয়োজন নতুন নতুন চিন্তাধারা নিয়ে আসা, নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করে সময়ের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা। গত প্রায় ৩-৪শ বছর ধরে মুসলমান সমাজে এই সৃষ্টিশীলতার প্রবাহ আটকে গেছে। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের ওপর প্রকৃত দুর্যোগ নেমে আসে ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে। এই বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে যেমন এখানে কলোনির শাসন শুরু হয় এবং কলোনির সুবাদেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার

এ দেশীয় বরকন্দাজরা বাঙালি মুসলমান সমাজকে পুরোপুরি ভেঙে-চুরে ওলট-পালট করে দেয়। এর ফলে বাঙালি মুসলমানের ভেতর শিক্ষিত শ্রেণি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আবার এর পাশাপাশি রাষ্ট্রিক বিরূপতার কারণে বাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ী, জমিদার ও ধনিকশ্রেণির অস্তিত্বও বিপণ্ন হয়ে ওঠে। ফল হয় পরবর্তী প্রায় দু'শ বছর ধরে বাঙালি মুসলমানের সামনে আদর্শ সমাজ বলে কিছুই থাকে না। এরকম একটা পরিস্থিতি হীনম্মন্যতার জন্ম দেবে এটাই স্বাভাবিক। বাঙালি মুসলমান চোখ মেলে দেখতে পেল এমন কিছু নেই, যা দিয়ে তারা নিজেরা গর্ব করতে পারে। কারণ তার চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায়, অন্য সমাজের লোক– তারাই শিক্ষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর, ধনে ও প্রাচুর্যে প্রতাপশীল। আর এভাবেই তাদের মধ্য শুরু হয় অনুকরণশীলতা।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ইংরেজের পৃষ্ঠপোষণায় জেগে উঠল। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ইংরেজের আমলাতন্ত্রে চাকরি নিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তারা প্রতিষ্ঠা পেল। তখনকার বাঙালি মুসলমান সমাজ তাই দেখে মনে করল– এই ভাবে এই পথ ধরে অগ্রসর হতে পারলে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। ওরা যে আদর্শ মেনে নিয়েছে, সেইটা মেনে নেওয়াই এখন আমাদের বড়ো কর্তব্য। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– এই হীনম্মন্যতা ও অনুকারিতার পথ ধরে সেদিন বাঙালি মুসলমান সমাজে, উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় যে বাবু সংস্কৃতির চর্চা চলত, যা তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে বাঙালি সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত পেয়েছিল, তা অবলীলায় ঢুকে পড়ল। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই বাঙালি সংস্কৃতির ভূত আজও আমাদের ছাড়েনি। শুধু বাঙালি মুসলমান নয়; লক্ষ করলে বোঝা যায়– এই হীনম্মন্যতা আজ পুরো মুসলিম দুনিয়াকেই ছেয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের একাংশের মধ্যে এরকম একটা চৈতন্য কাজ করছে একালে পাশ্চাত্য দুনিয়া যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে বহু দূর এগিয়ে গেছে, সুতরাং তাদের আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা অনুকরণ করাই শ্রেয়। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো– কেন মুসলমানের মধ্যে এ ধরনের বিচ্যুতি ও বিকৃতি এলো?

মুসলমানের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, আছে নিজস্ব ইতিহাস ও ট্রাডিশন, আছে নিজস্ব ধর্মবোধ। এসব কিছুই একদিন শুরু হয়েছিল মদিনা থেকে।

তারপর এ সংস্কৃতি ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁক ঘুরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিকশিত হয়েছে। তা দামেশক, বাগদাদ হোক অথবা স্পেন, তুরস্ক, মিশর, সুদান, মধ্য এশিয়া, উপমহাদেশ বা সুদূর ইন্দোনেশিয়া হোক– সেটা মুসলমানের নিজস্ব কালচার। মুসলিম ঐক্য বা সংহতির মূলে আছে এই বৈশ্বিক মুসলিম কালচার সম্বন্ধে একটা গর্ববোধ। এই বোধটা এ কালের মুসলমানের মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত বলা যায়। নিজের তাহজিব-তমুদ্দুন নিয়ে এই গর্ববোধ নেই বলে, নিজের Tradition থেকে একটা বড়ো রকমের ছেদ তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার সেই তুফান বন্ধ হয়ে গেছে বলা চলে। মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে কোনো সমাজের পক্ষেই নতুনতর কোনো কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না।

সেই মূলধারাটা কী? আমাদের যে ক্লাসিকাল ঐতিহ্য, আমাদের যে ক্লাসিকাল ভাষা-সাহিত্য, তার সাথে আমরা একেবারেই যোগ হারিয়ে ফেলেছি। বিশেষ করে এ কথাটা বাঙালি মুসলমানদের জন্য সর্বতোভাবে সত্য। আমাদের আদর্শের ভিত প্রস্তুত হয়েছে সেই মদিনায়। কুরআন-হাদিস হচ্ছে আমাদের আকরগ্রন্থ। এ হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, কনস্টিটিউশন আর ম্যাগনাকার্টা। এগুলোকে বাদ দিয়ে মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। মুসলমানের এসব বাণী ও আদর্শের বার্তা এসেছে আরবি ভাষার মাধ্যমে, কতকটা ফারসি ও উর্দুর পথ ধরে। বলা চলে– এসবের সাথে আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে গেছি। এসব ভাষার সাথে আমাদের যোগও ছিন্ন হয়ে গেছে। এভাবে এ কালের জেনারেশন বড়ো হয়ে উঠছে নিজের ঐতিহ্যকে না জেনেই। অনেক শিক্ষিত ছেলে আছে, যারা আধুনিক নানা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছে কিংবা কারিগরী জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে– ইসলামের মৌলিক অনেক বিষয় সম্বন্ধেই তারা অনবহিত রয়ে গেছে। কুরআন-হাদিসের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, পুরো একটা জেনারেশন একটা Tradition gap-এর মধ্যে পড়ে গেছে এবং এই Tradition-টাকে এখানে এখন অনেকে বলছে– একটা বিদেশি জিনিস। সেই কারণেই এখানে এখন অনেকেই সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে, তাহলে আমরা কে ও আমাদের Tradition বলে কি কিছুই নেই? এরকম একটা দিক-বিদেশহীন অবস্থায় আমাদের হাত পাততে হচ্ছে, সেই উনিশ

শতকের মতো কখনও কলকাতার বাবু সংস্কৃতির কাছে, কখনও পশ্চিমের ধ্যানধারণার দিকে। আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে বঙ্কিমের আদর্শে, শুনতে হচ্ছে রবি ঠাকুর আমাদের আদর্শ। রবি বাবুই আমাদের সবেধন নীলমণি, এর বাইরে আমাদের আর কিছু নেই। মুসলমানের মধ্যে এরকম একটা Tradition gap তৈরি হোক, সেরকম চেষ্টা ঔপনিবেশিক শক্তি সেকালেই করেছিল, একালেও তার ধারাবাহিকতা প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এরকম ট্রাডিশন-বিচ্যুত একটা সমাজকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায় এবং এখানকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যলুপ্তি তাতে সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

সে কারণেই এখানকার Education policy-কে বিভিন্ন সময় এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, যাতে সেখানে ইসলামি আদর্শের কোনো ছাপ একেবারেই না থাকতে পারে। ভাবটা এমন– মুসলমান শিক্ষিত হোক অসুবিধা নেই, কিন্তু ইসলাম যেন তার বোধে ও মননে আদৌ কাজ করতে না পারে। ঔপনিবেশিক আমলে তো বটেই; উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে এসেও এখানকার Education policy-কে সর্বতোভাবে ইসলামমুক্ত করার জন্য হাতিয়ার উচিয়ে রাখা হয়েছে। ইসলামি শিক্ষা ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা তো আছেই। এদেশে স্কুল পর্যায়ে আরবি ভাষা বাধ্যতামূলক করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নানা রকম যুক্তি দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করুন যুক্তিগুলো কত অদ্ভুত ও অবৈজ্ঞানিক– আরবি একটি বিদেশি ভাষা, এটা শিশুর ওপর চাপিয়ে দিলে শিশুর মনোবিকাশকে ব্যাহত করবে। অথবা বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি আরবি শিক্ষার চেষ্টাকে বলা হয়েছে এতগুলো ভাষা যদি শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে নাকি শিশুর মনোবৈকল্য ঘটবে।

দুনিয়ার সব ভাষাতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেছেন অনেকগুলো ভাষা একযোগে শিখতে কোনোই অসুবিধা নেই এবং ভাষা আয়ত্ত করবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে শৈশবকাল। একই কথার প্রধিতধ্বনি করেছেন একালের আমেরিকার রেডিক্যাল বুদ্ধিজীবী ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রথিতযশা নোয়াম চমস্কিও। অবাক করার বিষয় হচ্ছে– যেসব যুক্তি আরবি ভাষার বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে, সেসব কথা কিন্তু ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কখনও শুনিনি।

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের কাল থেকে। বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত ও পাদরিরা ছিনতাই করে নিতে চেয়েছিল। উত্তর ঔপনিবেশিককালে এসে বাঙালি মুসলমান জড়িয়ে পড়েছে ভাষার রাজনীতির এক চক্রে। রাজনীতির এই চক্র বাঙালি মুসলমানকে তার ঐতিহ্যের বিরাট বিশ্ব থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। ভাষার রাজনীতি যেমন একদিকে বাঙালি মুসলমানকে তার ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তেমনি বাকি বিশ্বের সাথে জানাজানির পথকেও করে তুলেছে ক্রমহ্রাসমান। ফলে বাঙালি মুসলমান হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিকভাবে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। এই বিচ্ছিন্নতা তার জন্য নিয়ে এসেছে এক নিরালম্ব হতাশার কাল; যে হতাশা তার কর্মশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা উভয়ই কেড়ে নিয়েছে।

এটা তো ইতিহাসের সত্য, মুসলমানরা বাংলাদেশে আসার পর এখানে তারা একটা উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ তৈরি করতে পেরেছিল। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তারা যে একটা বড়ো রকমের অবদান রাখতে পেরেছিল তা বলাই বাহুল্য। এটা কী করে সম্ভব হয়েছিল? লক্ষ করলে দেখা যায়– সেকালেও মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান বা আলাওলের মতো বড়ো মাপের প্রতিভাবান কবির জন্ম হয়েছিল। এরা বাংলা চর্চা করেছেন, বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন। কিন্তু মুসলমান সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি– তার থেকে তারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি কিংবা যে আরবি-ফারসির মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম সংস্কৃতির মূল ধারাটা প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার সাথে এরা খুব ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। এরা বাংলার সাথে সাথে আরবি-ফারসির চর্চাও করেছেন, ফলে এরা আমাদের যা দিতে পেরেছেন, তার মূল্য যথেষ্ট। এ ধারার শেষ উজ্জ্বল প্রতিনিধি হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর পক্ষে বড়ো মাপের মৌলিক কাজকর্ম করা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, তিনি বাঙালি মুসলমানের এই Cultural Base-টা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সংস্কৃতির জগতের পাশাপাশি সেকালের রাজনীতিবিদরাও মুসলমানের এই ঐতিহ্যের ধরনটা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন না। সেকারণেই আমরা এক সময় নওয়াব সলিমুল্লাহ, ফজলুল হক প্রমুখের মতো রাজনীতিবিদ পেয়েছি– যারা একসময়

বাংলার গণজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ঐতিহ্যের যোগটা ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই কী সংস্কৃতির জগতে, কী রাজনীতির জগতে– সবর্ত্রই একটা বন্ধ্যাত্ব ও উষরতার কাল শুরু হয়েছে।

ঐতিহ্যের এই ফলবতী চেহারাটা বুঝতে আমরা একটু ইউরোপের দিকে নজর দিতে পারি। আজকে যারা ইংল্যান্ডে-ফ্রান্সে-জার্মানিতে-ইতালিতে সাহিত্য চর্চা করেন বা এসব ভাষায় বড়ো বড়ো সাহিত্যিক হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন, তাদের সবারই কমবেশি ইউরোপের ক্লাসিকাল সাহিত্য গ্রিক ও ল্যাটিনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। শেলি, কিটস, ব্রাউনিং থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের তাবত কবিরা তো বরাবরই গ্রিস আর ইতালিকে তাদের মনোরাজ্যে স্বপ্নের আর কিংবদন্তির দেশ বানিয়ে রেখেছেন। এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের কালচার, ফ্রান্সের কালচার, ইতালির কালচার বুঝতে হলে গ্রিক-ল্যাটিন ভাষা ও সংস্কৃতির কাছে গিয়ে বুঝতে হবে। এই গ্রিক-ল্যাটিন কালচারের ধারাটা বুঝতে পারলেই একালের ইংল্যান্ড বা ইউরোপের অন্যান্য কালচারের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারব। এখন হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ইউরোপের সবাই তো আর এই ভাষা জানেন না বা সরাসরি এসব ভাষা চর্চা করেন না। সেটা হয়তো এক অর্থে ঠিক, কিন্তু এই ঐতিহ্যের সাথে তারা সম্পর্কচ্যুত হয়ে যাননি। তরজমার মাধ্যমে এই গ্রিক বা হেলেনীয় কৃষ্টি, কালচার ও দর্শনকে তারা ঠিকই বুঝে নিচ্ছেন। এখনও হোমারের *ইলিয়ড-ওডেসি*, দান্তের *ডিভাইন কমেডি*, ভার্জিলের কবিতা কিংবা সফোক্লিসের নাটক যেভাবে ইউরোপের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এমনকি শেক্সপিয়র বা গ্যাটের সাহিত্যও আজ ইংল্যান্ড বা জার্মানির ঐতিহ্য নয়; এটি পুরোপুরি ইউরোপের কমন কালচারের অংশ হয়ে উঠেছে। এই যে কমন ঐতিহ্যের ব্যাপারটা, তার থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে গেছি। কালচারের যে প্রবাহটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের মধ্যে চলে আসছিল, তার যেন হঠাৎ করেই ছেদ পড়ে গেছে। আগেই বলেছি, এখানে ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি বা রাজনীতি এই মুসলিম সংস্কৃতির প্রবাহকে বেশখানি ক্ষুণ্ন করেছে। এ ছাড়া মুসলিম দেশগুলোতে সেক্যুলার ন্যাশনালিজমের প্রাদুর্ভাবও এই কালচার দুর্বল হয়ে যাওয়ার পেছনে কতকটা দায়ী। আগে আমাদের এখানে বাংলার পাশাপাশি আরবি-ফার্সির চর্চা চলেছে। ধর্মের ভাষা হিসেবে আমরা আরবি পড়েছি। কুরআনের ভাষা হিসেবে এটির মর্ম

আমরা বিশেষভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছি। সাদি-জামি-রুমির সাহিত্য এ দেশের ঘরে ঘরে পঠিত হয়েছে এবং এর রস আস্বাদন করে বাঙালি মুসলমান আপ্লুত হয়েছে। ইকবাল, গালিবকে আমাদের কখনও পর মনে হয়নি। এইভাবে একই ব্যক্তির মধ্যে বহুভাষার সৃষ্টিশীলতার এক জঙ্গম তৈরি হয়েছে। বাঙালি মুসলমানও এর মধ্যে পেয়েছে আন্তর্জাতিকতার বোধ, এক বিশ্ব মুসলিম মনন ও চৈতন্য এর মধ্যে গড়ে উঠেছে।

এখন এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে আরবি-ফারসির চর্চাটা যেন পুরোপুরি মাদরাসার দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। আরও বিশেষভাবে বললে বলতে হয়, এসব মাদরাসায় যারা ছাত্র হিসেবে আসছে, তারা অনেকটা অর্থনৈতিকভাবে সমাজের নীচুতলার অংশ থেকেই আসছে। ফলে এসব ভাষা বা ঐতিহ্যের সাথে এদের কিছুটা পরিচয় হলেও পুরো সমাজটার ওপর তাদের প্রভাব বলয় সৃষ্টি হতে পারছে না। ফলে বর্তমান যুগের একটা ছেলে, যে কিনা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছে, তাদের মনে একটা দ্বন্দ্ব বা সংশয় জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ, একদিকে তাদের আরবি-ফারসির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, ঐতিহ্য সম্বন্ধে তারা একবারেই অজ্ঞ। অন্যদিকে সে যখন নিজস্ব সামাজিক, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দিকে তাকায়, তখন তার জীবনের অনেক ব্যাপারই তার নজরে আসে– যার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা সে এই তথাকথিত বাঙালি কালচারের মধ্যে খুঁজে পায় না। এইভাবে সে নিজের মধ্যে ক্রমাগত এক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

ইতিহাসবিদ টয়েনবি কালচার সম্বন্ধে একটা সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, কালচারের একটা সার্কেল (Circle) বা চক্র থাকে। সেটা কী রকম? যেমন আজকের ইউরোপীয় কালচার হচ্ছে একটা পশ্চিম ইউরোপীয় কালচার। তার পেছনে রয়ে গেছে একটা খ্রিষ্টান কালচার, আর তার পেছনে রয়েছে গ্রিক ও রোমান কালচার বা হেলেনীয় কালচার। লক্ষ করুন, একটা হলো হেলেনীয় কালচার, তার মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টান কালচার, তার মধ্যে আবার আছে পশ্চিম ইউরোপীয় কালচার এবং সবশেষে যে কালচারটি রয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে ব্রিটিশ কালচার বা ইউরোপের অন্যান্য কালচার। ইউরোপীয় কালচার আমরা কোনোদিনই ঝুঝতে পারব না; যদি না আমরা এই চক্রটার সামগ্রিক পরিচয় পাই। বাঙালি মুসলমানের

কালচারটা বুঝতে গেলেও এরকম একটা চক্রের আশ্রয় আমাদের নিতে হবে। বাঙালি মুসলমানের কালচারের মধ্যে আছে বাংলাদেশের কালচার, তার মধ্যে আছে একটা মুসলমান কালচার, আবার তার মধ্যে আছে আরব-ইরানের কালচার, আরো বিশেষ করে বললে মদিনার কালচার। বাঙালি মুসলমানের কালচারের এই চক্রটা টুটে-ফেটে গিয়েছে কলোনির কালে। ফলে এখন তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এক ক্রান্তি ও সংকটের মুহূর্ত।

দুই.

বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির মূল প্রবাহটা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে– এ কথা আগে বলেছি। এই বিচ্যুতি থেকে উদ্ধার না পেলে আমরা মুসলমান হিসেবে টিকতে পারব না। সেজন্য চাই আমাদের আদর্শের পুনরাবিষ্কার। আমাদের আদর্শ কেমন, আমাদের মূল্যবোধের স্বরূপ, আমাদের জীবনের ধারণা, আমাদের Social structure এগুলো পুরোপুরি জানা চাই। সেটা করতে হলে আমাদের ইতিহাস জানতে হবে, ঐতিহ্য সম্বন্ধেও পুরোপুরি অবহিত হওয়া জরুরি। যিনি লেখাপড়া জানেন, যার মধ্যে জ্ঞান আছে, তিনি মোকাবিলা করতে পারবেন বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের বিরুদ্ধে যে ঝড় ধেয়ে আসছে তার। কিন্তু যিনি জানেন না, তিনি কী করে মোকাবিলা করবেন? প্রতিবাদই-বা করবেন কী করে? আসলে এটিই হচ্ছে আমাদের সমস্যা। এই না জানার সমস্যা এখন বাঙালি মুসলমানের কালান্তক রোগে পরিণত হয়েছে। এই অজ্ঞানতার সুযোগে আমাদের যা গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই আমরা অবলীলাক্রমে গলধকরণ করে ফেলছি।

আমাদের স্কুল-কলেজের বইপত্র, টেক্সট বুক বলে যা চালানো হচ্ছে, তা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কতখানি তুলে ধরতে পেরেছে? এগুলো দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই শুরু হয়। তারপর আমাদের মিডিয়া– যার পুরোটাই এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে বাঙালি সংস্কৃতির বলয়ের লোকজন, তার প্রভাব তো আছেই। এর কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না এবং এভাবেই একটা জেনারেশন বেড়ে উঠছে যারা তাদের অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানে না। অসংখ্য বই দিয়ে দেশটাকে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। এর কিছু আসছে কলকাতা থেকে, কিছু এখানেই ছাপা হচ্ছে। এসব বইয়ের

একটাই উদ্দেশ্য– কলকাতার বাবু সংস্কৃতিকে সর্বস্তরে পূজনীয় ও আদর্শ স্থানীয় করে তোলা। যেহেতু এর কোনো সবল প্রতিবাদ নেই, তাই এখনকার জেনারেশন ভাবছে– এটাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং একে সাথে নিয়ে চলায় সুবিধা বেশি। অথচ এরা জানেই না, এর সাথে আমাদের সত্যিকার কালচারের কোনো মিল নেই। আর এভাবেই আমাদের ছেলেরা রবীন্দ্রনাথকে অবধারিত করে নিচ্ছে, কুরআন বাদ দিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্রাডিশনাল আরবি নামগুলো বর্জন করে বাঙালিত্বের নামে হিন্দু নাম ধারণ করছে। এভাবে হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে চলে আসছে।

আজকাল একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ছে। এতকাল বিয়ের অনুষ্ঠানে নওশা সাধারণত আচকান-পায়জামা ও শেরওয়ানি পরে আসতেন। এখন একটা পরিবর্তন দেখছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নওশা সুট-প্যান্ট পরতে শুরু করেছেন; অন্যদিকে শেরওয়ানি তারা বর্জন করছেন। এ পরিবর্তনটা অনেকের চোখে পড়তেও পারে, নাও পারে, কিন্তু এ পরিবর্তন এক সুদূর প্রসারী ইংগিত দেয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে শেরওয়ানি পরা ছিল আমাদের এখানকার কালচার। সেই কালচারের ভিত নাড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে এখানকার বাঙালিবাদীরা। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় আমাদের শুনতে হবে বিয়ের অনুষ্ঠানে শেরওয়ানি না পরাটাই আদর্শ, ওটাই বাঙালি কালচার। এই একটা জিনিস স্পষ্ট– আমরা এখন একটা উন্নত মতাদর্শ ও কালচার বাদ দিয়ে একটা নিকৃষ্ট জিনিসকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি বাঙালি কালচার নামে। এর প্রতিবাদ জরুরি।

মুসলমানরা যখন এ দেশে আসে তখন তারা এক উন্নত সভ্যতা সাথে করে নিয়ে এসেছিল। এ কোনো আবেগাচ্ছন্ন উক্তি নয়; এটি সর্ববাদী সম্মত ঐতিহাসিক সত্য। আল-বেরুনির *‘কিতাবুল হিন্দ’* পড়লে দেখা যায়, মুসলমানরা আসার আগে এখানকার সংস্কৃতি কতদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। নরবলি, সতীদাহ, বর্ণপ্রথা– এগুলো আর যা-ই হোক সভ্যতার অংশ বলা চলে না। বাদশাহ বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় একই রকম কথা বলেছেন। বাবরনামা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> এদেশের কৃষক ও নিম্নশ্রেণির লোকেরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই চলাফেরা করে। অল্প এক টুকরা কাপড় কোনো রকমে মালকোছার মতো পরে

তারা তাদের নগ্নতা ঢাকে। এটাকে তারা বলে লেঙ্গুটি। মেয়েদের কাপড়েরও একই অবস্থা। তবে তাদের কাপড় একটু বড়ো। তারা এ কাপড় কোমরেও বাঁধে, আবার একটা দিক মুড়িয়ে ঘোমটাও দেয়।[১]

এরকম একটা সংকীর্ণতার জালে আবদ্ধ সমাজে ইসলাম এক পরিচ্ছন্ন ও উদার মানবতাবাদী সংস্কৃতির অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, যার প্রভাব ভারতে বিশেষ করে বাংলার গণজীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এসব কথা শুধু মুসলমান নয়; হিন্দু ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদেরাও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও আমরা বেমালুম আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছি, বাছবিচারের ক্ষমতা আমাদের অনেকখানি লুপ্ত হয়েছে এবং অন্যের নিকৃষ্ট মালকে আমরা সংস্কৃতির নামে রীতিমতো আত্মস্থ করে ফেলছি। আমরা যখন বলি, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির অংশ, সূর্যসেন-ক্ষুদিরাম আমাদের জাতীয় বীর, তখন আমাদের ইতিহাস জ্ঞানের দারিদ্র্য ধরা পড়ে। আমাদের আদর্শবোধ ও ধর্মবোধের বেহাল অবস্থার কথা চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করিয়ে দেয় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। বঙ্কিম-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-সূর্যসেন প্রমুখ সবাই নানা রকম প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তারা সবাই স্ব-সমাজের জন্য বড়ো রকমের অবদান রেখেছিলেন সন্দেহ নেই। একটা জিনিস লক্ষ করার মতো, ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজের সহযোগিতায় বাঙালি হিন্দুর মধ্যে যে জাগরণ এসেছিল এরা সবাই তাতে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে এরা ইউরোপের সংস্পর্শে এলেও সকলেই সেই পুরাতন হিন্দু কালচারকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণ হিন্দু সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি, যিনি *'মানুষের ধর্ম'* নামে এক বই লিখেছিলেন এবং সেখানে উদারমানবতাবাদ চর্চার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, সেই তিনিও শান্তি নিকেতনে প্রাচীন ভারতের আদর্শে প্রাণিত হয়ে তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তি নিকেতন বা বিশ্বভারতীতে যেসব প্রথা ও পদ্ধতি চালু করা হয়, তা পুরোপুরি প্রাচীন ঔপনিষদিক রীতি অনুসারে করা হয়েছিল। এ জিনিসটাই লক্ষ করার মতো, এই যে এভাবে একজন নিজের কালচারের মধ্যে ফিরে আসছে।

---

১. জহীর-উদ্‌দীন মুহম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা* (তরজমা : ইবরাহীম খাঁ)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

কিন্তু আমাদের বাঙালি মুসলমান সমাজের কারও কারও মধ্যে একটা মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়। কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, হুমায়ুন কবীরের মতো সাহিত্যিকরা বললেন অন্য কথা। তাদের ধারণা ছিল– আমরা বাঙালি। আমরা যে ইসলাম অনুসারী, এই ধর্মটা আমরা গ্রহণ করেছি বাইরের প্রয়োজনে। এটা ছেড়ে দিলেই আমাদের মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত হবে। ওদুদ সাহেব তার '*শাশ্বত বঙ্গ*' বইতে এসব কথাই বলতে চেয়েছেন। বিশেষ করে তার প্রবন্ধের বাণীগুলো যদি কেউ গ্রহণ করে, তবে তার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে মুসলমান হিসেবে গৌরব করার কিছু থাকে না। এই গৌরবহীনতা ও আত্মহীনতার পথে আজও কেউ কেউ এগুচ্ছেন– এ নিছক আত্মহনন ছাড়া কিছু নয়। আত্মহননের পথে কেউ কি কোনো বড়ো কিছু অর্জন করতে পারে? এরকম নজির পৃথিবীর কোথাও নেই। এর থেকে ফিরে আসা দরকার। এর জন্য চাই ইতিহাসের চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। নতুন করে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন। সেই পথেই আসতে পারে আমাদের জাতীয় মুক্তি; অন্য কোনোভাবে নয়।

সংস্কৃতির ধারা

লোক সংস্কৃতি সব দেশে থাকে। একটি সমাজের বহু বছরের ভাঙা-গড়া আর বিবর্তনের মধ্যে লোক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। মানুষের জীবনের অনেক স্থূল চাহিদা থাকে। লোক সংস্কৃতি তার অভাব পূরণ করে। কিন্তু একটা দেশের সংস্কৃতি বলতে কেবল সে দেশের লোক সংস্কৃতিকে বোঝায় না। তার চেয়েও উঁচু স্তরের একটা সংস্কৃতি থাকে। এই উঁচু স্তরের সংস্কৃতি ওই সমাজ বা জাতির সৃষ্টিশীলতা, মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এই উঁচু স্তরের সংস্কৃতি ছাড়া একটা জাতির অগ্রসরমানতাকে চিহ্নিত করা যায় না।

আমাদের দেশেও লোক সংস্কৃতির একটা ধারা আছে। গানে, গাঁথায়, কাহিনিতে, কিংবদন্তিতে, ধাঁধাঁয়, প্রবচনে, যাত্রায়, বৈশাখী নবান্নের উৎসবে এই ধারা প্রবহমান। এই জনসংস্কৃতি লোক রঞ্জনের এক অপূর্ব উৎসব। এর কাজ সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেওয়া। আনন্দ দেওয়ার বাইরেও সংস্কৃতির একটা কাজ আছে। অন্তহীন অন্বেষণ, গভীরতর অনুভূতি, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ– এসব কিন্তু লোক সংস্কৃতি দিয়ে চলবে না; তার জন্য চাই উচ্চতর সংস্কৃতি।

এ দেশে যখন ইসলাম আসে, তখন এখানকার লোক দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম এখানে খালি হাতে আসেনি। তার ভান্ডারে ছিল মহামূল্যবান ঐশ্বর্য। নতুন চিন্তা, নতুন সংস্কৃতি, নতুন বিশ্বাস, নতুন মূল্যবোধ। এখানে একটি নতুন মুসলমান সমাজ তৈরি হয়। তাদের ধর্ম হয় ইসলাম। নামকরণ হয় আরবিতে। কতকক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচারে। এই যে নতুন সমাজ তৈরি হয়, সে সমাজ এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাসের মধ্যে নিজের অতীতকে পুরোপুরি

খুঁজে পায় না। পায় ইসলামের ইতিহাসে। তেমনি এর সংস্কৃতিও সম্বন্ধ খোঁজে ইসলামের সংস্কৃতির মধ্যে। এই নতুন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নাম প্যান ইসলাম। একই সাথে টেরিটোরিয়াল, আবার সুপরা-টেরিটোরিয়াল। কয়েকশ বছরের মুসলিম শাসনে এই সংস্কৃতি আরও সংহত হয়। হয় বহুপ্রসূ। এই সংস্কৃতি এখানকার উচ্চতর সংস্কৃতি হিসেবে জায়গা করে নেয়। এই সংস্কৃতিকে ভরিয়ে তোলেন রাজন্যবর্গ, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা। এরই আলো ছড়িয়ে পড়ে আমজনতার মধ্যে।

এর মানে এই নয়, এই সংস্কৃতির চাপে লোক সংস্কৃতি হারিয়ে যায়। প্রত্যেকে যে যার জায়গায় অবস্থান করে। সংঘর্ষ যে হয় না এমন নয়। প্রাচীন বঙ্গের ঐতিহ্য, পালযুগের ঐতিহ্য, বৌদ্ধ যুগের ঐতিহ্যের সাথে ইসলামের জোড়া কীভাবে লাগবে! কিংবা লোক সংস্কৃতির যেসব উপাদান এই সব ঐতিহ্য থেকে পাওয়া, তার সাথেই-বা ইসলাম কী করে মিল-মিশাল করবে! ইসলাম সহাবস্থানে বিশ্বাসী, কিন্তু সমন্বয়ে নয়। ইসলাম তার মূল্যবোধের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। এজন্য মঙ্গল প্রদীপ, সিঁদুর, উলু, অন্নপ্রাসন, লক্ষ্মীর সরা, রামায়ণের গান লোক সংস্কৃতির অংশ হয়েও ইসলামের নয়। ইসলাম লোক সংস্কৃতির ওইটুকু গ্রহণ করে, যেটুকু তার মূল্যবোধের সাথে সহনীয়। মুসলিম সংস্কৃতির এই গ্রহণ-বর্জনের মাত্রা নির্ধারণের দায়িত্ব এককভাবে ইসলামের হাতে।

ইসলামের ইতিহাস শুরু সেই খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস তার চেয়ে প্রাচীন। সেই ইতিহাসের সাথে ইসলাম তার নিজের ইতিহাসের সহাবস্থান করে নেয়। যেখানে সহাবস্থান সম্ভব হয় না সেখানে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষ সংস্কৃতির সংঘর্ষ।

ইসলাম এদেশে আসে তুর্ক, মোঘল, পাঠানদের হাত ধরে। এরা সবাই মুসলমান নামে পরিচিত হয়। এর আগে ভারতে এসেছিল শক-হুনরা। এরা কিন্তু হিন্দু বনে যায়। তাই তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষ হয় না। হয় মুসলমানদের সাথে। কারণ, তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি হয় না। এভাবে ভারতের লোকসংখ্যার চারভাগের একভাগ এক সময় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে। হিন্দু অতীতের সাথে যোগসূত্র ছিন্ন করে। তারা মুসলমান হয়ে যায়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি এক সময় ভারত বিভাগ হয়ে

যায় এবং পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী জাহানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান দ্বিধা-বিভক্ত হলেও বাংলাদেশের মুসলিম মানস কিন্তু ইসলামি জাহানের সাথে জুড়ে আছে।

ইতিহাসের এই ধারাভঙ্গ হয় যখন ইউরোপীয়রা এদেশ দখল করে নেয়। তারা নিয়ে আসে নতুন মূল্যবোধ। সেই মূল্যবোধকে বলা হয় আধুনিকতা। সেই আধুনিকতাও অতীতের সাথে সম্বন্ধ একরকম ছিন্ন করতে চায়– বিশেষ করে ইসলামের সাথে। ইসলামের সংস্কৃতি ধর্মমূলক। আবার সংস্কৃতির সাথে ইসলামের সম্বন্ধ খুব গভীর। কিন্তু আধুনিকতা সংস্কৃতিকে ধর্মবর্জিত উপাদান দিয়ে গড়তে চায়। যদিও এ চিন্তা অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো। ধর্ম ছাড়া কোনো সমাজ, কোনো সংস্কৃতি চিন্তাই করা যায় না। এশিয়ায় না, আফ্রিকায় না, এমনকি ইউরোপেও না। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো সেক্যুলার দাবি করে, কিন্তু তাদের সমাজ-সংস্কৃতি মোটেই সেক্যুলার নয়। পশ্চিমের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কতকটা গ্রিক-রোমান ঐতিহ্য ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের মিল-মিশালে। সেখানকার বড়ো বড়ো ক্যাথেড্রাল, ইস্টার, গুড ফ্রাইডে, বড়ো দিন পশ্চিমের সমাজের সেক্যুলারইজেসনের কথা বলে না। ধর্মের প্রেরণা সংস্কৃতিকে অমরত্ব দিয়েছে। কোথাও কোথাও অমৃত। অজন্তা-ইলোরার শৈল ভাস্কর্য, তাজমহল, আলহামরা, মস্ক অফ কর্ডোভা, ইউরোপের বড়ো বড়ো গথিক ক্যাথেড্রালগুলো শিল্প হিসেবে তুলনাহীন। ডালি, পিকাসো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর শিল্পকর্মের চেয়ে এর গুরুত্ব কম নয়। ডালির শিল্প, পিকাসোর শিল্প শিল্পানুভূতি সৃষ্টি করে; ধর্মানুভূতি নয়। ওগুলো দুটিই করে।

আমাদের আধ্যাত্মিকতাও দরকার, আধুনিকতাও দরকার। দুটো মিলেই সংস্কৃতির ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্য আধুনিকতা বলতে আমি বিজ্ঞানকেই বোঝাই; আধ্যাত্মিকতাবর্জিত পশ্চিমের নীতি ও মূল্যবোধ নয়। ধর্মের সঙ্গে শিল্প ও বিজ্ঞানকে আমরা মিলিয়ে নিতে চাই।

ইউরোপের রেনেসাঁ আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। রেনেসাঁর নায়করা ঈশ্বরকে অভ্রান্ত মনে করেননি। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তারা জগতের সব রহস্য ভেদ করতে চেয়েছিলেন। এই যে সীমাহীন স্বাধীনতা রেনেসাঁর লক্ষণ। মনে রাখা দরকার, সীমাহীন স্বাধীনতা একধরনের স্বেচ্ছাচারও বটে। রেনেসাঁ ইউরোপকে স্বেচ্ছাচারীও বানিয়েছিল। সম্রাজ্যবাদ রেনেসাঁর

হাত ধরেই তৈরি হয়। পরস্বাপহরণ, পররাজ্য লুণ্ঠন, শিশু হত্যা, নারী হত্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এসবই রেনেসাঁসের আরেক পিঠ; যেমন চাঁদের আরেক পিঠে কলঙ্ক।

ইউরোপীয়রাই এদেশে রেনেসাঁ-রিফরমেশন-এনলাইটেনমেন্টের খবর নিয়ে আসে। সেই চিন্তায় উজ্জীবিত হয় প্রথমদিকে হিন্দুরাই। কলকাতাকে কেন্দ্র করে একধরনের কলোনির রেনেসাঁ গড়ে ওঠে। ইউরোপের সঙ্গে পা মেলানোর জন্য কলকাতার হিন্দুরা উন্মুখ হয়ে ওঠে। হিন্দুদের দেখাদেখি একসময় মুসলমানরাও এগিয়ে আসে। তারাও ইংরেজি শিখতে শুরু করে। সেই সুবাদেই তারা ইউরোপের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। মুসলমান সমাজের একটা অংশ ধীরে ধীরে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। তাদের মধ্যে রেনেসাঁর হাওয়া লাগে। সেক্যুলারিজমের চিন্তা-ভাবনাও পল্লবিত হয়। তাদের ভেতরকার মুসলিম সংস্কৃতির ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। এরাই সংস্কৃতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার জন্য ওকালতি শুরু করেন। গত শতকের ত্রিশের দশকে ঢাকায় শিখা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এর কাণ্ডারী ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখ। এদের কাজকর্ম অনেকটা উনিশ শতকের কলকাতার হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের মতো ছিল। এরা চেয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের মতো বুদ্ধির মুক্তি। মানে শাস্ত্রের, ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্তি। ইউরোপের রেনেসাঁ, সেক্যুলার হিউম্যানিজম এদের খুব টেনেছিল। মুসলিম সমাজের তারা পরিবর্তন চেয়েছিলেন এই আঙ্গিকে। কিন্তু মুসলিম সমাজ ইসলামকে বাদ দিয়ে কীভাবে তাদের সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটাবে– এই গভীর প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারেননি। এরা সবাই ধার্মিক মুসলমান পরিবারের সন্তান ছিলেন, কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে ইসলামকে তারা ত্যাগ করেছিলেন। কিছুটা ইউরোপীয় আর কিছুটা কলকাতাকেন্দ্রিক উনিশ শতকীয় হিন্দু সংস্কৃতির মিল-মিশাল দিয়ে তারা তাদের কল্পস্বর্গ গড়ে তুলেছিলেন। এরা ছিলেন যত না মুসলমান, তার চেয়ে কট্টর বাঙালি।

এই শিখা গোষ্ঠীর একজন ছিলেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। তিনি একটা অদ্ভুত বই লিখেছিলেন, নাম '*সংস্কৃতি কথা*'। তাতে তিনি বলেছিলেন– ধর্ম হচ্ছে অশিক্ষিত লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের ধর্ম।[১] নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে হীনমন্যতা কতদূর জন্মালে আর নিজের

---

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*। ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৬।

শিকড় থেকে কতদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এ ধরনের বালখিল্য উক্তি করা সম্ভব। চৌধুরী সাহেবের কথা মানতে হলে এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, শিক্ষিত লোক ধর্মানুসারী হতে পারে না। চৌধুরী সাহেবরা যাদের মস্তজ্ঞান করেছিলেন, সেই উনিশ শতকীয় বিবর্তনের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রমুখ অনেকেই অধার্মিক ছিলেন না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্ম রীতিমতো সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পর্যায়ে পড়ে। নিজেদের যুক্তিতে তারা নিজেরাই হেরে যান। এসব করে তারা শুধু শুধু নিজেদেরই প্রতারিত করেছেন। চৌধুরী সাহেব কিংবা তার মতানুসারীদের একটা সমস্যা হলো– তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে নিয়েছেন ইসলামকে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম– কোনো কিছুই তাদের ব্যাখ্যাত আধুকিতা ও প্রগতির প্রতিবন্ধক নয়; কেবল ইসলাম ছাড়া। এ চেতনা ও মনোভাবকে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতাই বলা যায়।

শিখাপন্থিদের চিন্তা-ভাবনা অনুসরণ করেছেন পরবর্তীকালে আরও কেউ কেউ। আব্দুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ। এরা আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন বাঙালিত্বের সাধনার কথা।

এই সাধনার মানে কী? আমরা বাংলা ভূখণ্ডে বাস করি, বাংলা ভাষায় কথা বলি, আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, শুটকি মাছ খাই– এটা কি বাঙালিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়? না। তারা বললেন– হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা। মানে আরেকটা দ্বীন-ই-ইলাহি। হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতি থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করবে। মুসলমানও নেবে হিন্দুর থেকে। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে হারিয়ে যাবে। এই হারিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি আসলে একধরনের জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি। এরকম চেষ্টা উপমহাদেশে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু হালে পানি পায়নি। আকবর চেষ্টা করেছিলেন। দিল্লিশ্বর ও জগদীশ্বর হয়েও তিনি সফল হতে পারেননি। তার সেনাপতি মানসিংহই এর প্রতিবাদ করেছিলেন। আকবরের আরেক বংশধর দারা শিকোহর কাজকর্মও সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। নানক, কবীর, সার্মাদ ও আমাদের দেশের বাউলপন্থি সন্যাসীদের লোকজ কাজকর্মও বৃহত্তর জনসমাজে সাড়া পায়নি। বৃহত্তর হিন্দু সমাজে বা মুসলমান সমাজে এ ধরনের জনসমর্থনহীন কার্যকলাপ কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। যার জন-আবেদন নেই, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া বৃথা। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা সেই দুঃসাধ্য সাধনায় মেতে উঠেছেন।

এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা আজকাল লোক সংস্কৃতির উজ্জীবনের কথা বলছেন। তারা যে সেক্যুলার ও সমন্বয়ী বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলেন, তার জন্য এক ধরনের প্রতীক দরকার। সেই প্রতীক হিসেবে লোক সংস্কৃতির কথা এসেছে। ইসলামকে বাদ দিয়ে তারা যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারও প্রতীক এটা। আটশ বছর ধরে যে উচ্চতর সংস্কৃতি এখানকার জনগণের মনমানসিকতা ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার বিকল্প হিসেবে তারা লোক সংস্কৃতির বিকাশের ওপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু ওই উচ্চতর সংস্কৃতির বিকল্প লোক সংস্কৃতি হতে পারে না। যেমন– ইসলামের বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না। আটশ বছর যা সম্ভব হয়নি, তা হওয়ার সম্ভাবনা এখন একেবারেই নেই। লোক সংস্কৃতির জায়গায় লোক সংস্কৃতি থাকবে। ইসলামের জায়গায় ইসলাম থাকবে। যেমন– পহেলা বৈশাখের জায়গায় পহেলা বৈশাখ, ঈদ উৎসবের জায়গায় ঈদ উৎসব। যে যার জায়গায় থেকে ইতিহাস এগিয়ে যাবে। কখনোই একটির বিকল্প আরেকটি নয়। একটির বিকল্প হিসেবে আরেকটিকে দাঁড় করাতে গেলে তৈরি হবে সংকট। আমাদের ইতিহাসে এর নজির প্রচুর। সমন্বয় নয়; সহাবস্থানই আমাদের কাম্য।

সংস্কৃতির সমস্যা

সংস্কৃতির সাথে রাজনীতির সম্পর্ক গভীর, যেন একটি আরেকটির অপর পিঠ। কখনও সংস্কৃতি রাজনীতিকে তাতায়, আবার কখনও রাজনীতি সংস্কৃতির লক্ষ্য ঠিক করে। আমাদের উপমহাদেশে এর উদাহরণ প্রচুর।

উনিশ শতকে নবগোপাল মিত্র নামে একজন হিন্দুমেলার প্রবর্তন করেন। এ মেলার উদ্দেশ্য ছিল– প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে হিন্দুর আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনা। বেদের যুগকে, রামায়ণের যুগকে সাংস্কৃতিকভাবে ফিরিয়ে আনার এই চেষ্টায় সেকালের অনেক হিন্দু মনীষীই প্রচুর সময় দিয়েছিলেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন।

এই যে অতীতের সাথে বোঝাপড়া, এর মাধ্যমে হিন্দুরা একধরনের রিভাইভালিজমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই হিন্দুমেলা থেকে আসে স্বদেশী আন্দোলন। এ আন্দোলনের একটা রাজনৈতিক রূপও ছিল, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভ্রমবোধ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, পরে শ্রী অরবিন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ছিল সেকালে হিন্দু রিভাইভালিস্টদের বাইবেল।

স্বদেশী আন্দোলনের একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যেমন ধ্বনির হয় প্রতিধ্বনি। ভারতবর্ষ কখনোই এক জাতি-ধর্মের দেশ ছিল না। ছিল মিশ্র জাতি-ধর্মের দেশ। এক জাতি-ধর্মের দেশ হলে হিন্দু রিভাইভাল এক পথে এগোতো। মিশ্র ধর্মের হওয়ায় এখানে হিন্দু রিভাইভাল মুসলমানদের শঙ্কিত করে তুলল। হিন্দুর সাজ সাজ রব মুসলমানকে করে তুলল স্বাতন্ত্র্যকামী। সেখান থেকে এলো মুসলিম রিভাইভালের চিন্তা। তাই পরে যখন কংগ্রেসের কোনো কোনো সেক্যুলার নেতা হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বললেন, তখন তা কাজে লাগল না। কারণ, রাজনৈতিক মিলনের আগেই সাংস্কৃতিক বিভাজন পুরো হয়ে গেছে।

দেখা গেল– যে আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলো, শেষ পর্যন্ত তা ঠেকল গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে। হিন্দু রিভাইভালের বিপরীতে দাঁড়াল মুসলিম রিভাইভাল। এরপরে হিন্দুর রাজনীতি ও সংস্কৃতি বনাম মুসলিম রাজনীতি ও সংস্কৃতি। সেখান থেকে কংগ্রেস বনাম মুসলিম লীগ। একসময় ভারত ভাগ দিয়ে তার পরিণতি। ভাগ হয়েও কি সবকিছুর শেষ হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার সময় কংগ্রেসের নেতারা বলেছিলেন, ভারত যাবে সেক্যুলারিজমের পথে। রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের, সম্প্রদায়গত কোনো সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকবে না। মানবিকতা, মানবকল্যাণ হবে নতুন রাষ্ট্রের মূলকথা। কিন্তু কংগ্রেসের সেই নেতারাই যারা সেক্যুলারিজমের কথা বললেন, তারাই সবাই মিলে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রীয় সংগীত করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমকে। হিন্দু রিভাইভালিজমের সেই প্রতীক এলো সেক্যুলার ভারতের পরিচয় দিতে। এইভাবে বর্তমানের ভারত হাত মিলালো তার অতীতের সাথে। সেক্যুলার ভারত সখ্যতা গড়ল তার মৌলবাদী সত্তার সাথে। এ অনেকটা আজকালকার পশ্চিম বাংলার কমিউনিজমের মতো। একই সাথে কমিউনিজম চলছে, আবার দুর্গাপূজা, কালীপূজাও চলছে। সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ কখন কীভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তা বলা কঠিন। এখানে যারা পাকিস্তান আন্দোলনকে, দ্বিজাতিতত্ত্বের চেতনাকে অহর্নিশ মধ্যযুগীয় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিরস্কার করেন, তারা এ ঘটনাগুলোকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন তা জানি না।

উনিশ শতকের হিন্দু মেলার সাথে অনেকখানি তুলনা চলে আমাদের ঢাকায় ষাটের দশক থেকে চালু হওয়া বৈশাখী মেলার। এর উদ্যোক্তারা ঠিক হিন্দু মেলাকে সামনে রেখে এ মেলার শুরু করেছিলেন কিনা তা বলতে পারি না। তবে হিন্দু মেলার অনেক চরিত্র বৈশিষ্ট্যই বৈশাখী মেলা আত্মস্থ করেছে। হিন্দু মেলার অভিমুখ ছিল রাজনীতি ও হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। বৈশাখী মেলার অভিমুখও হলো রাজনীতি ও বাঙালিত্বের জাগরণ। মজার ব্যাপার হলো– বাঙালি বলতে ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলা ভাষাভাষীকে বোঝালেও বাঙালির ঐতিহ্য হিসেবে মেলার উদ্যোক্তারা শুধু প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য, বৌদ্ধ যুগের ঐতিহ্য, হিন্দু যুগের ঐতিহ্যকে টেনে নিয়ে আসেন। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি; অথচ তাদের ঐতিহ্যগুলোই থাকে এখানে অনুপস্থিত। পহেলা বৈশাখের উদ্যোক্তাদের এ ফাঁকির দিকটি না ধরতে পারলে তাদের গোপন অভিসন্ধি বোঝা যাবে না।

লোকজ উৎসব হিসেবে পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব আমাদের সমাজে সব সময় ছিল। আমাদের গ্রামের প্রধান জনসমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এখনও কৃষিভিত্তিক। এই দিকটি বিচার করেই বাংলা সনের গণনার সিলসিলা আরম্ভ হয় বাদশাহ আকবরের কাল থেকে। নতুন বছরকে গ্রহণ করার জন্য কৃষিভিত্তিক এই সমাজে তাই তখন থেকেই একধরনের সামাজিক প্রস্তুতিও তৈরি হয়েছিল। নববর্ষের দিনে গ্রামে-গঞ্জে মেলা হতো। সেসব মেলায় বারোয়ারি, লোকগীতি, যাত্রা, কবিগান, পালাগান এসব চলত। কোথাও কোথাও মৃৎশিল্পীরা তাদের তৈরি করা জিনিস মেলায় নিয়ে আসতেন। আর এসব মেলায় বিক্রি হতো নানান রকম মিষ্টি। সেসব মিষ্টির নামও ছিল হরেক রকমের। কোথাও কোথাও ঘোড়দৌড়ও হতো। এই উৎসব একান্তই আমাদের গ্রামীণ কৃষিসমাজের সার্বজনীন আনন্দোৎসব।

গ্রামীণ জীবনের সাথে মিশে যাওয়া এই লোকজ উৎসবের সাথে কিন্তু হাল আমলে চালু হওয়া নাগরিক পহেলা বৈশাখের কোনো সম্পর্ক নেই। এর উদ্যোক্তারা পহেলা বৈশাখের লোকজ চরিত্রকে সামনে রেখে এটির মধ্যে কৌশলে একটি নাগরিক চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং একশ্রেণির শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সেক্যুলার ব্যক্তি এই উৎসবের ভেতর দিয়ে গত কয়েক দশক ধরে তারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছেন। এরা বলছেন– পহেলা বৈশাখ হচ্ছে সকল বাংলাভাষীর ধর্ম নির্বিশেষে এক সার্বজনীন উৎসব। আদতে এটির মধ্যে বৃহত্তর মুসলমান জনগোষ্ঠীর কোনো ঐতিহ্যের ছাপ না থাকায় এটি হয়ে উঠেছে একটি সাম্প্রদায়িক উৎসব। কিন্তু পহেলা বৈশাখের লোকজ চরিত্র দিয়ে আড়াল করে রাখায় তাদের উদ্দেশ্যমূলক কার্যক্রম সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। উনিশ শতকের হিন্দু মেলার পথ ধরে তৈরি হয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। আজকালকার পহেলা বৈশাখের পথ ধরে বিকাশ হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। অথচ আমাদের যে লোকজ পহেলা বৈশাখ, তা বৃহত্তর অর্থে গ্রামসমাজে আজও এক আনন্দোৎসব। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা তার কাম্য নয়।

হিন্দু মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার– বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ। নাগরিক পহেলা বৈশাখ ও তার পৃষ্ঠপোষকদের জন্য রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে এক অনন্ত প্রেরণা। তারা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথই বাঙালি জাতিসত্তার প্রধান প্রতীক। যদিও লোকজ পহেলা বৈশাখে

রবীন্দ্রনাথের স্থান একেবারেই নেই। উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদ মুসলিম স্বার্থের বৈরী হয়ে উঠেছিল। এই জাতীয়তাবাদ সেদিন মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়েছিল। বৈশাখী মেলার বাঙালি জাতীয়তাবাদও একইভাবে এখানকার মুসলিম মানস, চৈতন্য ও জাতীয়তাবোধকে চায় খর্ব করে দিতে। এই খর্বকারীরা কলকাতার হিন্দু সংস্কৃতি ও পশ্চিমের সেক্যুলার মূল্যবোধের মিল-মিশাল দিয়ে নিজেদের জন্য একটি সংস্কৃতি তৈরি করে নিয়েছেন এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা ইসলামকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন। হাল আমলের এই নাগরিক বৈশাখী উৎসবে তাই যোগ হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা, উলুধ্বনি, শঙ্খরব, উলকি, রাখিবন্ধন প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি– যাকে ঘটা করে বলা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে এখন দাঁড় করানো হয়েছে এ অঞ্চলের মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে। এমনিভাবে এই মেলা উনিশ শতকের হিন্দুমেলার ঐতিহ্যকে পুরোপুরি গিলে ফেলে এখানকার মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত নড়বড়ে করে দিতে চাইছে।

এখানকার সেক্যুলারিস্টরা তাদের প্রাক-ইসলামি অতীত নিয়ে এখন যথেষ্ট গৌরব বোধ করছেন। তারা শ্লাঘা বোধ করতে আরম্ভ করেছেন প্রাক-ইসলামি হিন্দু ঐতিহ্য, বৌদ্ধ ঐতিহ্য প্রভৃতি নিয়ে। পাল যুগের ঐতিহ্য, সেন যুগের ঐতিহ্য এখন তাদের কাছে দূরবর্তী কিছু নয়। মুসলমানের ঘরে জন্ম নেওয়া অনেক খাঁটি বাঙালি এখন এমন কথাও বলছেন, মুসলমানরা এ দেশে না এলেই ভালো করত। তাহলে এ দেশের অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়ী সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ হতে পারত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এরাও এখন বখতিয়ার খিলজিকে শ্রেফ আক্রমণকারী হিসেবেই দেখছেন। মুসলিম সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে এখন বলা হচ্ছে অন্ধত্ব ও মৌলবাদ। ঔদার্যের নামে প্রকৃতপক্ষে চলছে দ্বীন-ই-ইলাহি মার্কা সংস্কৃতি বিকাশের চেষ্টা। কোনো কোনো বাঙালি মুসলমানের ইসলামপূর্ব ঐতিহ্যের কাছে আশ্রয় নেওয়ার এই লক্ষণকে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।[১] আসল কথা হচ্ছে– এ একধরনের স্বদেশ ত্যাগ। এক ধরনের কালচারাল মাইগ্রেশন। বৃক্ষের পক্ষে মূল অস্বীকার করা আর বাঙালি মুসলমানের পক্ষে ইসলাম উপেক্ষা করা একই কথা। ইসলামই হচ্ছে

১. বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*। ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৬৯।

বাঙালি মুসলমানের প্রকৃত স্বদেশ, প্রকৃত কালচারাল হোমল্যাণ্ড। মজার ব্যাপার হলো– নিজের অতীতকে, নিজের ধর্মকে, নিজের ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে যখন অন্যের কাছে এমনি করে হাত পাতা হয়, তখন তাকে আত্মহনন ছাড়া কীই-বা বলা যায়। এর মস্ত উদাহরণ হচ্ছে– আজকের আরবরা। পশ্চিমের প্ররোচনায় একসময় তারা আরব জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকেছিল এবং বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক তুর্কি খিলাফতকে ধ্বংস করতে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সেসময় মুসলমানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলতে তাদের বিবেক বাধেনি। আমাদের সেক্যুলারিস্টদের মতো আরব সেক্যুলারিস্টরাও এখন তাদের প্রাক-ইসলামি অতীত নিয়ে করে একধরনের গৌরববোধ। প্রাক-ইসলামি কবি ইমরুল কায়েস, তারাফা, যুহাইর, আনতারা প্রমুখকে নিয়ে তাদের শ্লাঘার শেষ নেই। ইসলামপূর্ব যুগকেও তারা আগের মতো আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসেবে মনে করে না। এমন কথাও তারা বলছেন– প্রাক-ইসলামি পৌত্তলিক কবিরা যদি আরবি ভাষার সত্যিকার বিকাশ না ঘটাতেন, তবে কুরআনের মত মহাগ্রন্থ আরবিতে রচিত হতে পারত না। কুযুক্তি বোধ হয় একেই বলে।

এই আরব ন্যাশনালিসট ও সেক্যুলারিস্টরা পাশ্চাত্যের ধামা ধরে বহুরকম আরব ঐক্যের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোনো চেতনা বা মূল্যবোধ– তা সোশালিজম বা ন্যাশনালিজম যা-ই হোক, কোনোটিই তাদের ঐক্যের ভিতকে মজবুত করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদের পা ধরে তারা যে আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাও শেষ হয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতায়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর তুর্কি খিলাফতের পতনের পর আরবদের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা ভেস্তে যায় পাশ্চাত্যের মদদে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। এই ক্ষুদ্র ইজরাইলের উৎপাতে আজ আরবরা অসহায়। সেক্যুলারিজম, সোশ্যালিজম, ন্যাশনালিজম সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকা– কোনো কিছুই তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঠেকাতে পারেনি।

এই অসহায় আরবদের দেখে আমাদের এখানকার সেক্যুলারিস্টরা কিছুটা হলেও শিক্ষা নিতে পারেন।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংস্কৃতির ভূমিকা

এক.

পুঁজিবাদ চায় মুনাফা, প্রবৃদ্ধি ও ভোগ। লাভ আর ভোগ– এই হচ্ছে ধনবাদী দর্শনের প্রত্যয় এবং এই প্রত্যয় দিয়েই তারা পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। পুঁজিবাদ ইনসাফ চেয়েছে, সাম্য চেয়েছে, দারিদ্র দূরীকরণ করতে চেয়েছে– এ কথা কেউ জোর গলায় বলতে পারবে না। তাই গত কয়েকশ বছর ধরে ধনবাদী দর্শন পৃথিবীকে নানারকমভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও সকলের আরাধ্য সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচারের ধারণা ও মূল্যবোধ কিন্তু আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইউরোপে রেনেসাঁর পথ ধরে ধনতন্ত্রের জয়জয়কার শুরু হয়। সেই ধনতন্ত্র আবার এগিয়ে চলে সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে। অনেক তাত্ত্বিকের মতে– কলোনিগুলো ছিল ধনবাদী দর্শনের বিশেষ একটি রূপ। ইউরোপের বণিকশ্রেণি কলোনির ধনসম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য তৈরি করেছিল সাম্রাজ্যবাদী একটি ছক। সেই ছক ধরেই কীভাবে কলোনির সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ ও কালে পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়, তার সব চেষ্টাই হয়েছিল।

চরিত্রের দিক দিয়ে সেদিনের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও আজকের পাশ্চাত্য উদ্ভূত বিশ্বায়নের ধারণার মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। কমিউনিজমের পতন, ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি প্রভৃতি ঘটনা পশ্চিমের দেশগুলোকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। এ প্রেক্ষিতেই পশ্চিমের পণ্ডিতেরা নিয়ে এসেছেন ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব। এক্ষণে ধনবাদী রাষ্ট্রগুলোর সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্ত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের নতুন মওকা খুঁজে পেয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়ন নামের মধ্যে একটা চমক আছে। মনে হতে পারে, এটি বোধ হয় জগৎদব্যাপী একটা প্রক্রিয়া– যার মধ্যে পুরো মানবপ্রজাতি নানাভাবে জড়িয়ে আছে এবং এর মধ্যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। মূলত এটি হচ্ছে পশ্চিমের নয়া সাম্রাজ্যবাদী একটা কৌশল, যার লক্ষ্য হচ্ছে– একটি বিন্দু থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমের ধনবাদী রাষ্ট্রগুলো এই পৃথিবীর সব রকমের ব্যাবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এর মূলে আছে ধনবাদী দর্শনের ভোগাকাঙ্ক্ষা। সব নীতি, মূল্যবোধ এখানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অধিক মুনাফা আর অধিক ভোগের আশায়।

এমন একটা বিশ্বাস ও প্রত্যয় অহর্নিশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেন লাভ ও ভোগ ছাড়া সভ্যতার কোনো অর্থ নেই। জীবন মানেই আরও আরও ভোগ। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঔপনিবেশিক শক্তি গায়ের জোরে পুরো দেশটা দখল করে নিত, পরে সেখানে মতাদর্শগত আধিপত্য বিস্তার করে পুরো সমাজ থেকে নিজেদের শাসন ও কর্তৃত্বের সমর্থনে একটা বৈধতা জোগাড় করার চেষ্টা করত। এই বৈধতা দিতেন ঔপনিবেশিক শক্তির পেটোয়া সমাজনেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। মনে পড়বে আমাদের এখানে ব্রিটিশ কলোনির সমর্থনে রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নানারকম লেখালিখি ও বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন। বিশ্বায়নের যুগে এসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু লক্ষ্য রয়েছে অবিচল।

প্রথম প্রথম মনে হয়, বিশ্বায়ন একটি নিষ্কলুষ ব্যাপার। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পারস্পরিক পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ, অভিগমন (Immigration) ও নির্গমন (Migration), প্রযুক্তির আদান-প্রদান, তথ্যের অবাধ বিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে পুরো পৃথিবীটাই যেন একটা global village বা বিশ্বগ্রামে পরিণত হতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে ধনবাদী রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন আধিপত্য বিস্তার করে আছে যে, অনুন্নত দেশগুলোর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে এবং তাদের স্বার্থরক্ষার কোনো উপায় আর থাকছে না। ধনবাদী দেশগুলোই আজ নির্ধারণ করে দিচ্ছে, দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোটি। স্বাধীন দেশ বলে আর কিছু থাকছে না। বিশ্বায়ন পালটে দিচ্ছে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, দেশপ্রেমের সেই পুরোনো ছককাটা ধারণা।

একালের ইনফরমেশন টেকনোলজি এমন একটা গতিময়তা সৃষ্টি করেছে যে, Nation State Boundary'র ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। ভৌগোলিক ব্যবধান দিয়ে এখন আর আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন ঠেকানো যাচ্ছে না। একালে ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট প্রভৃতি দেশের ধারণাকেই রীতিমতো মুছে দিচ্ছে। উন্নত তথ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির জোরে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ অনুন্নত বিশ্বকে আজ নিজের নজরদারির মধ্যে নিয়ে এসেছে। তাদের ইশারায় দুর্বল দেশগুলো স্বাধীনতা একরকম বিসর্জন দিতে চলেছে। এ কাজে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হচ্ছে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। এ সমস্ত সংস্থাকে এখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ রীতিমতো রাবার স্ট্যাম্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ছেড়েছে। বিশ্বায়ন তাই ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চমৎকার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। শুধু পুঁজির আধিপত্য নয়; বিশ্বায়ন চাইছে পৃথিবী জুড় এক ভোগবাদী পণ্য সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে। সাম্রাজ্যবাদের নীতি-নির্ধারকরা বিলক্ষণ জানে এই ভোগ্যপণ্যবাদ, এই সুপারমার্কেটজাত কালচার যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অনুন্নত ও গরিব দেশের জনসাধারণের নিজস্ব ঐতিহ্যজারিত যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এই নিঃশেষিত অনুন্নত শ্রেণিকে স্থায়ীভাবে দাবিয়ে রাখা তখন অবশ্যই সহজতর হবে।

দুই.

সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি, কতক ক্ষেত্রে অর্থনীতি। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও অর্থনীতি এখন অনুন্নত দুনিয়ায় বিশেষ করে ইসলামপ্রধান দেশগুলোর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির দিকটি প্রথমে উলটে-পালটে দেখা যাক।

কমিউনিজমের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এক কল্পিত শত্রুর খোঁজে দুনিয়া জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ইসলামকে এখন তাদের মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। এরই আধুনিক পরিণতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের নামে ইসলামপ্রধান দেশগুলোকে নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির জোরে সাম্রাজ্যবাদ বিরামহীনভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কাউকে আঘাত করতে হলে আগে তার চরিত্র হনন করা চাই। ইসলাম মানেই বর্বরদের ধর্ম। সাম্রাজ্যবাদের এই নিষ্ঠুর প্রচারণা আজ এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে, এভাবে ইসলামকে আঘাত হানার পক্ষে তারা একটা পূর্বপরিকল্পিত বৈধতাও অর্জন করতে শুরু করেছে।

ইসলামপ্রধান দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ তার সব রকমের অন্যায় কাণ্ডের বিরোধীতাকারীদের নাম দিয়ে দিচ্ছে মৌলবাদী– আর মৌলবাদী মানেই সন্ত্রাসী। মৌলবাদী বলা হচ্ছে তাদেরকেই, যারা নাকি ইসলামের ন্যায়নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেদের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংহতি ধরে রাখতে চায়। সুতরাং ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধেই আজ পাশ্চাত্যের যত ক্ষোভ ও বিষোদ্‌গার। কারণ, তারা ভালোভাবেই জানে, এই ইসলামপন্থিরাই পাশ্চাত্যের ধনবাদী ও ভোগবাদী দর্শন কায়েমের পথে বড়ো বাধা। সাম্রাজ্যবাদ ইসলামপ্রধান দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করে না। কারণ, এরা তাদের সহযোগী শক্তি। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আজকে মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকরাই সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ। এই বশংবদ লোকজনকে দিয়েই আজ পাশ্চাত্য মুসলিম দেশগুলোতে একটা স্থিতিহীন পরিবেশ জিইয়ে রেখেছে– যাতে মুসলিম উম্মাহ্ কার্যকর অর্থে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

তিন.

সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক নীতি ও কার্যক্রম যতখানি স্থূল, অর্থনৈতিক নীতি ঠিক সেরকম নয়। সহজে এর অকল্যাণকর দিক প্রতিভাত হয় না। ধনবাদী অর্থনীতি নীরবে একটি ভোগবাদপ্রবণ পণ্য সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এটি থেকে তৈরি হয় Comodity Fetishism বা পণ্যের আরাধনা। তথ্যপ্রযুক্তির জোরে এই পণ্য সংস্কৃতি আজ শহর ছেড়ে গ্রামেও হানা দিচ্ছে। পরিণতিতে মানুষের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে আত্মসর্বস্বতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও জনবিচ্ছিন্নতা। এর বিপজ্জনক প্রভাব গিয়ে পড়ছে আমাদের মূল্যবোধের ওপর। মূল্যবোধের অবক্ষয় আজ সমাজের স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

এতকাল সাম্রাজ্যবাদ Multi culturalism–সাংস্কৃতিক বহুত্বের তত্ত্ব ফেরি করে বেড়িয়েছে। যদিও সে প্রথমাবধি এই বহুত্বের চিন্তা-ভাবনা কাজে-কর্মে কখনও প্রতিষ্ঠিত করেনি। কলোনির মানুষের ওপর, অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড-ত্রিনিদাদ প্রভৃতি স্থানের আদিবাসীদের ওপর সাম্রাজ্যবাদ যে ব্যবহার করেছে, তা সাংস্কৃতিক বহুত্বের ধারণাকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখন বিশ্বায়নের যুগে সাম্রাজ্যবাদ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা এখন বিভিন্ন মানুষ ও সমাজের পৃথক আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতায় আদৌ বিশ্বাসী নয়। বিশ্বায়ন সংস্কৃতির Homogenization –সমরূপকরণে বিশ্বাসী। বিশ্বায়ন সংস্কৃতিকে ছাঁচে ঢেলে নিজের মতো করে ভাঙতে চায়, গড়তে চায়। সংস্কৃতির স্বাধীন অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করে না। এই Monolithice–একমার্গী চিন্তা নিষ্ঠুর স্বৈরাচারকেও হার মানায়।

বিশ্বায়ন রাতদিন প্রচার করে যাচ্ছে, ভোগ আর ভোগের উপকরণের কথা, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তৈরি পণ্য-সামগ্রীর কথা, তাদের বাজার সৃষ্টির কথা। ভোগের উপকরণসহ আমরা রাতদিন ভোগবাদের জয়গান শুনে চলেছি– রেডিওতে, টিভিতে, বসার ঘরে, শোয়ার ঘরে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এভাবে আমরা নিজের অজান্তেই এই ভোগবাদের, এই পণ্য সংস্কৃতির সমর্থক হয়ে উঠছি। আমাদের মন-মগজ ধোলাই হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভেতরের যে জান্তব সত্তা, যে ভোগবাদী বৈশিষ্ট্য– যা চাপা পড়ে থাকে, এখন অনুকূল পরিবেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমাদের মানবিক সত্তা চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমরা স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ছি, পশুত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্বায়ন মুক্তবাজার, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও উন্নয়নের আদর্শের ধারণা প্রচার করেছে। এই সাথে খবর ও চিন্তার মুক্তপ্রবাহের কথা বলছে। আপাতদৃষ্টিতে এসব কথার মধ্যে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। ভোগ্যপণ্যের প্রচারের জন্য মুক্ত সংবাদ প্রবাহ দরকার। এভাবেই পুরো পৃথিবী জুড়ে তারা বাজার তৈরির জন্য নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করে এবং তাদের পক্ষে প্রস্তুত করে এক মানসভূমি। এই পথেই মিডিয়া আধিপত্য আজ মুসলিম দেশগুলোকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

একালে আমাদের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে রক মিউজিক, কম্পিউটার গেমসের ছড়াছড়ি। ধীরে ধীরে এটি নগর ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তারিত হচ্ছে। মূলত মার্কিন বিনোদনশিল্প অসামান্য দক্ষতায় এটির বাজার সৃষ্টি করেছে, আর আমাদের তরুণরা কোনো ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এর ওপর।

এই রক মিউজিক, কম্পিউটার গেমসের পরিণতি কী হচ্ছে? আমাদের শিশুরা এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকছে, কার্টুনের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। এভাবেই তার থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সব রকমের সৃজনশীলতা, বিকাশশীলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, ঐতিহ্যবোধ। তার ভেতর ঢুকে পড়ছে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। এই শিশু যখন বড়ো হবে তখন সে হয়ে উঠবে একটা বিষাদগ্রস্ত পুরুষ অথবা নারী। জাতিকে তার দেওয়ার বড়ো একটা কিছু থাকবে না। পশ্চিমের রক মিউজিকের মতো করে আমাদের দেশেও কিছু সংগীতগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই সব মিউজিকের সাথে আছে ড্রাগের সম্পর্ক। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠা এইসব উচ্চগ্রামের রক মিউজিকের দল কি প্রমোদ বিতরণ করছে, না আমাদের তরুণদের মাদকাসক্ত বানিয়ে ছাড়ছে?

প্রকৃতপক্ষে এই মাদকাসক্তি সমাজের গভীর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। এখন গ্রামে-গঞ্জেও ভিডিও, ভিসিডি ডালভাত। বিশ্বায়িত সংস্কৃতির আওতায় এইসব ভিডিও-ভিসিডির মাধ্যমে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যাবসা রমরমা। তেমনি রমরমা নীল ছবি সহ নানা ধরনের যৌন উত্তেজক ছবির ব্যাবসা। এখন আবার শুরু হয়েছে নিয়ন্ত্রহীন সাইবার ক্যাফের কালচার। অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগে পশ্চিমের যত রকমের পাপ আমাদের মধ্যে ঢুকছে, ওরা ব্যবসা করছে। মোটকথা মাদকাসক্তি, নীল ছবি প্রভৃতি তরুণদের নৈতিক শক্তিকে ভেঙে দিয়েছে। তারা আজ দিশেহারা। তাদের সামনে কোনো আদর্শ নেই, মডেল নেই। ফলে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ানক এক অরাজক পরিস্থিতি। সন্ত্রাস, খুন ধর্ষণ, ছিনতাই আমাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পশ্চিমের মুক্ত যৌনতার (Free sex) ধারণা আমাদের সমাজে ভালোরকম প্রবেশ করেছে। নরনারীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকছে না। এখন আমাদের তরুণদের মধ্যে প্রেম

নেই; আছে ভোগেচ্ছা বা যৌনলিপ্সা। মানবিক মূল্যবোধ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেখানে জায়গা নিচ্ছে একধরনের কৃত্রিমতা। প্রবৃত্তি আর যন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে মানুষ। এই ভোগ্যপণ্যবাদ যতবেশি করে আমাদের দেশে ঢুকছে, ততই আমরা হয়ে উঠছি উন্মূল, স্বার্থপর।

এখন পণ্য উৎপাদনে যত বেশি খরচ হয়, তার চেয়ে বেশি অর্থ ঢালা হচ্ছে পণ্যের বিজ্ঞাপনে। পণ্যের গুণাগুণ নয়; পণ্যের প্রচারণাই মূখ্য। সেই প্রচারণার সামনে পরাভূত হচ্ছে মানুষ। লক্ষ করুন– নিয়ন্ত্রণহীন ভারতীয় স্যাটলাইট চ্যানেলগুলো আমাদের দেশের জীবনযাত্রা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা কী পরব, কী খাব, পোশাকের ফ্যাশন কী হবে– সবই ঠিক করে দিচ্ছে এইসব চ্যানেলগুলো। এই কাজে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যবহার করছে চিত্রতারকাদের, ক্রিকেট স্টারদের। আজকাল আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবহার করি স্টারদের কথামতো। এমনকি নারীর বক্ষ সৌষ্ঠব কেমন হবে তাও নির্ধারণ করে দিচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। টুইগি, নওমি ক্যামবেল, পামেলা এন্ডারসনদের মডেল বানিয়ে ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে– নারীর ফিগার কেমন হবে, ফ্যাশন কেমন হবে, তাদের বুকের আকৃতি কেমন হবে। এই অ্যাড কালচার এখন আমাদের দেশেও বেশ রমরমা। যেভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে– তাতে বিভ্রম হয়, আমরা ঢাকা আছি না নিউইয়র্কে! আমাদের দেশেও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখানকার কারও কারও সহযোগিতায় চালু করেছে ফটোসুন্দরী প্রতিযোগিতা, সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এদেরকেই বেছে বেছে পরে অ্যাডের কাজে ব্যবহার করা হয়। পণ্যের বিজ্ঞাপনে এইসব মডেল হওয়া নারী কোনো দেশীয় কিংবা ধর্মীয় মূল্যবোধ মানছে না। চতুর্দিকে তারা পণ্যের প্রসারের পাশাপাশি কাম-হুতাশন জ্বালিয়ে দিতে ব্যস্ত। এদের অন্দরমহল অন্ধকারাচ্ছন্ন। টিভি পর্দায় এদের ঝলমলে ছবি দেখা গেলেও দুয়েকটি ঘটনা যখন বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পায়, তাতেই পুতি-দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

বৈশ্বিকভাবে যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়, তার উদ্দেশ্যও মোটামুটি একই। এখন তো আবার বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বের সুন্দরীদের বেছে বেছে বিশ্ব সুন্দরীর কাতারে নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরাই পরে বিজ্ঞাপনের মডেল হবে আর তৃতীয় বিশ্বে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভাগ্য খুলবে।

বিশ্বায়ন শুধু নারীকে বিজ্ঞাপনের মডেল বানিয়ে সন্তুষ্ট নয়; তার দেহকেও ব্যাবসার উপজীব্য বানিয়ে ছেড়েছে। পশ্চিমে Sex Industry একটা রমরমা ব্যাবসা। এর অনুকরণে তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে এই প্রমোদশিল্পকে রীতিমতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হচ্ছে। যেমন- থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া। অনেকেরই নজরে আসার কথা, এইসব দেহব্যবসায়ী নারীদের আমাদের দেশেও একটা সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে- যাতে এই ব্যাবসাকে একটা স্বাভাবিক ও নিয়মিত ব্যাবসা হিসেবে গণ্য করা হয়। এদেরকে আজকাল বলা হচ্ছে যৌনকর্মী। এদের পেশাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দেদারসে টাকা ঢালছে। সভা করে, সেমিনার করে, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের নানা রকমভাবে ব্যবহার করে এদের পক্ষে একটা মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী এখানকার এনজিওগুলো পয়সার বিনিময়ে এদের পেশাকে তুলে ধরার জন্য ইতোমধ্যে সভা-সমাবেশ পর্যন্ত করেছে। নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় তো পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে, কোথায় এইসব হতভাগ্য নারীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা হবে, তা না করে বিশ্বায়ন আজ আমাদের মতো দেশগুলোতে এই অপরাধী পেশাধারীদের শিকড় বিস্তৃত করে দিচ্ছে।

বিশ্বায়ন নিয়ে সবচেয়ে ভয় হলো- এটি পরিবারব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পশ্চিমে পরিবার-সংসার বলে কিছু নেই। সেখানে মানুষ শুধু নিজের জন্য; মানুষের জন্য নয়। পরিবারব্যবস্থার মূল শক্তি হলো নর-নারীর পারস্পরিক বিশ্বাস। বিশ্বাসহীনতা আজ পশ্চিমি সভ্যতার গভীরে পৌঁছে গেছে। সেখানে স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না, স্ত্রী স্বামীকে করে না। তাহলে পরিবারব্যবস্থা টিকবে কী করে? এরই পরিণতি হিসেবে সন্তানরা হারায় পরিবারের নিশ্চিত আশ্রয়, তারা ভাসমান হয়ে যায়। বিশ্বায়ন তথ্যপ্রযুক্তির জোরে পরিবারগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ভোগ্যপণ্যজাত সংস্কৃতি পরিবারের প্রেমময়, স্নেহময় পরিবেশকে তোয়াক্কা করে না। এর কাছে নর-নারীর পারস্পরিক যৌনতাই মূখ্য। তাই প্রথাগত বিয়ের বাইরে যৌনসঙ্গী হিসেবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়ন এইভাবে শুধু পরিবারকেই ভাঙছে না; মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসকেও উচ্ছন্নে দিচ্ছে।

বিশ্বায়নের সুপারমার্কেটজাত কালচার ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রযুক্তি আর বাজার দখল করে নেয় তার মানবিক সত্তা। বাজারী সংস্কৃতির প্রকোপে পড়ে সমাজ হয়ে যায় নীতিশূন্য, ভাবশূন্য। এই নীতিশূন্য সমাজই নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিকে। ব্যক্তির ভেতরে সৃষ্টি হয় এক বিচ্ছিন্নতাবোধ। তার সামাজিক বাঁধন আলগা হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তি স্রোতে ভেসে যায়। এর সাথে তার মানবীয় সম্পদও ভেসে চলে যায়। ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। মানুষ যে সম্পর্ক নিয়ে বাঁচে, জীবনকে মূল্যবান করে তোলে তা আর অবশিষ্ট থাকে না। বিশ্বায়ন মানুষের কাছ থেকে তার মনুষ্যত্ব কেড়ে নিচ্ছে। মানবিক হয়ে উঠার জন্য মানুষের যে লড়াই, বিশ্বায়ন আজ তার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছে।

চার.

বিশ্বায়নের এই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে বাঁচার উপায় কী? পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ বিশ্বায়নের ধাক্কায় বিপর্যস্ত ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে গা বাঁচানোর নীতি নিয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার লেখক, শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মীরা এ বিষয়টাকে আজও যথাযথ গুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা দেননি। বিশেষ করে ফিল্ম, টেলিভিশন, অডিও, ভিডিও, সংগীত, নাটক, কলা, সংস্কৃতি বা সংবাদমাধ্যম জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে। সেই সচেতনতা সৃষ্টির পক্ষে তাদের বর্তমান ভূমিকা যথেষ্ট নয়।

পাশ্চাত্য আর ইসলাম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে শুধু ভৌগোলিক পার্থক্য নেই; উভয়ের জীবনবোধ, দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্যেও রয়েছে বিরাট দূরত্ব। পাশ্চাত্যের দর্শন ইহমুখী, ভোগবাদী। বাজারের নিয়ম অনুযায়ী এক ক্ষণস্থায়ী মূল্য দিয়েই সবকিছুর বিচার হয়। মানুষের শাশ্বত মূল্যকে যাচাই করা হয় না। ইসলাম একই সাথে ইহমুখী ও পরলোক চিন্তার সমন্বয়। বস্তু ও আত্মার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এর দর্শন। এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম অনুসারীরা যথেষ্ট সচেতন। তাই নৈতিকতার মানদণ্ডে সবকিছুর মূল্য বিচার করতে হয় তাদের। এই নৈতিক শক্তি দিয়েই আজ ইসলাম অনুসারীদের বিশ্বায়নের ভোগবাদী সংস্কৃতির মোকাবিলায় বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে।

আজও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বিবিসি, সিএনএন প্রভৃতির সমকক্ষ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া চালু করতে পারেনি। না আছে তাদের হাতে রয়টার, এএফপি'র মতো তথ্য মাধ্যম। তথ্য-প্রযুক্তির প্রায় পুরোটাই করায়ত্ব করে আছে পাশ্চাত্য এবং এর মোকাবিলায় মুসলমানদের প্রস্তুতি নিতান্তই সামান্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জগৎ-সংসারে তাদের দৃশ্যমান ভূমিকা নেই। মুসলিম জনসাধারণ আজ দরিদ্র, নেতৃত্বশূন্য ও অনৈক্যের শিকার। তারা নিজেদের সম্পর্কে সচেতনও নয়। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জীবনচর্চার একটা দিক নির্দেশিত হয়, মানুষ নিজের জীবনে যার ব্যবহারিক চর্চা করে থাকে। ইসলামের জীবনানুগ চর্চার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সেই সংস্কৃতির পুনরুভ্যুত্থান ঘটতে পারে। এই সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া মুসলমানের মধ্যে সৃজনশীলতা আসবে না, বিকাশশীলতা তৈরি হবে না। মনে রাখা দরকার, সৃজনশীলতা দিয়েই সৃজনশীলতার মোকাবিলা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের নিজ নিজ জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, শুধু তাই নয়– এই সচেতনতাকে যথেষ্ট রকম বাড়াতেও হবে। জনগণ সচেতন না হলে ঐক্যবদ্ধ হবে না। আর ঐক্য ছাড়া পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার চেষ্ট নিষ্ফল হবে।

বহুকাল ধরে পাশ্চাত্য প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ইসলামের একটি ভয়ানক ও কুৎসিত ইমেজ গড়ে তুলেছে। তার সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে। আজকের সংস্কৃতিকর্মীদের ইসলাম সম্পর্কে এই ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। এজন্য তাদেরকে আধুনিক গণমাধ্যমগুলোর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার জানতে হবে এবং প্রয়োজনে এসব প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের সমস্যা হচ্ছে– আমাদের বুদ্ধিজীবিরা, সংস্কৃতিসেবীরা অনেকেই পশ্চিমি চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত। মুসলমানদের নিজস্ব সমস্যাকেও তারা পশ্চিমের আয়নায় দেখতে পছন্দ করেন। এই অন্ধ অনুকারিতা ছেড়ে ইসলামি চিন্তা ও নৈতিকতার আলোয় যুগ সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। অনুকরণ করে পৃথিবীতে কেউ মাথা জাগাতে পারে না। পশ্চিমের ইহবাদী ও ভোগবাদী দর্শনের বিপরীতে ইসলামি নৈতিকতা আজও একটি শক্ত ও

দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো। এইডস, সমকামিতা, ড্রাগ, বিবাহ বিচ্ছেদ, কুমারী মাতা, লিভিং টুগেদার, ফ্রি সেক্স প্রভৃতি অপসংস্কৃতি-কুসংস্কৃতি পশ্চিমের সম্পদ। মুসলমানরা যখন থেকে ইসলাম ছেড়েছে, তখন থেকেই এই রোগ তাদের সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। পশ্চিমের সামাজিক বন্ধন ও সংহতি বলে কিছু নেই। ওখানকার সংস্কৃতি গ্রহণ করতে গেলে আমাদের সামাজিক সংহতিও আলগা হয়ে যাবে। বিশ্বায়নের নামে অপসংস্কৃতির যে সয়লাব মুসলিম দেশগুলোতে ঢুকে পড়ছে, তার প্রতিরোধ একমাত্র ইসলামি নৈতিকতার অভ্যুত্থান ঘটিয়েই সম্ভব।

দীর্ঘদিন ধরে কলোনির আবহাওয়ায় থাকতে থাকতে আমরা পরাভূত মানুষ হিসেবে বিশ্বকে দেখতে শিখেছিলাম ইউরোপের চোখ দিয়ে। এমনকি ওই চোখ দিয়ে আমরা নিজেদের দেখতেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকরা আধুনিকতা ও প্রগতির মডেল হিসেবে পাশ্চাত্যকেই তুলে ধরেছিলেন। বিশ্বকে দেখার ও বিবেচনা করার এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা ন্যায়সংগত– তা আজ পুনর্বিচার করে দেখা দরকার। পশ্চিমি সভ্যতার শক্তি কতটুকু, তার নৈতিক বল কী রকম, এই সভ্যতা বৃহত্তর অর্থে মানব প্রজাতির জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক, তা আজ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। পশ্চিমি সভ্যতা তার ইহবাদী ও ভোগবাদী দর্শন দিয়ে বিশ্ব জুড়ে যে নৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, বিশ্বায়ন তারই একটি প্রক্রিয়া; বলা চলে একটি প্রান্তিক অবস্থা। এই প্রান্তিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে একটি নৈতিক মডেলকে আমাদের আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন। সেই বিকল্প হিসেবে ইসলামি নৈতিকতাকে আজ আমরা গ্রহণ করতে পারি।

***